Rby 2022 ▪ ˆR¨ô-Avlvp 1429

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

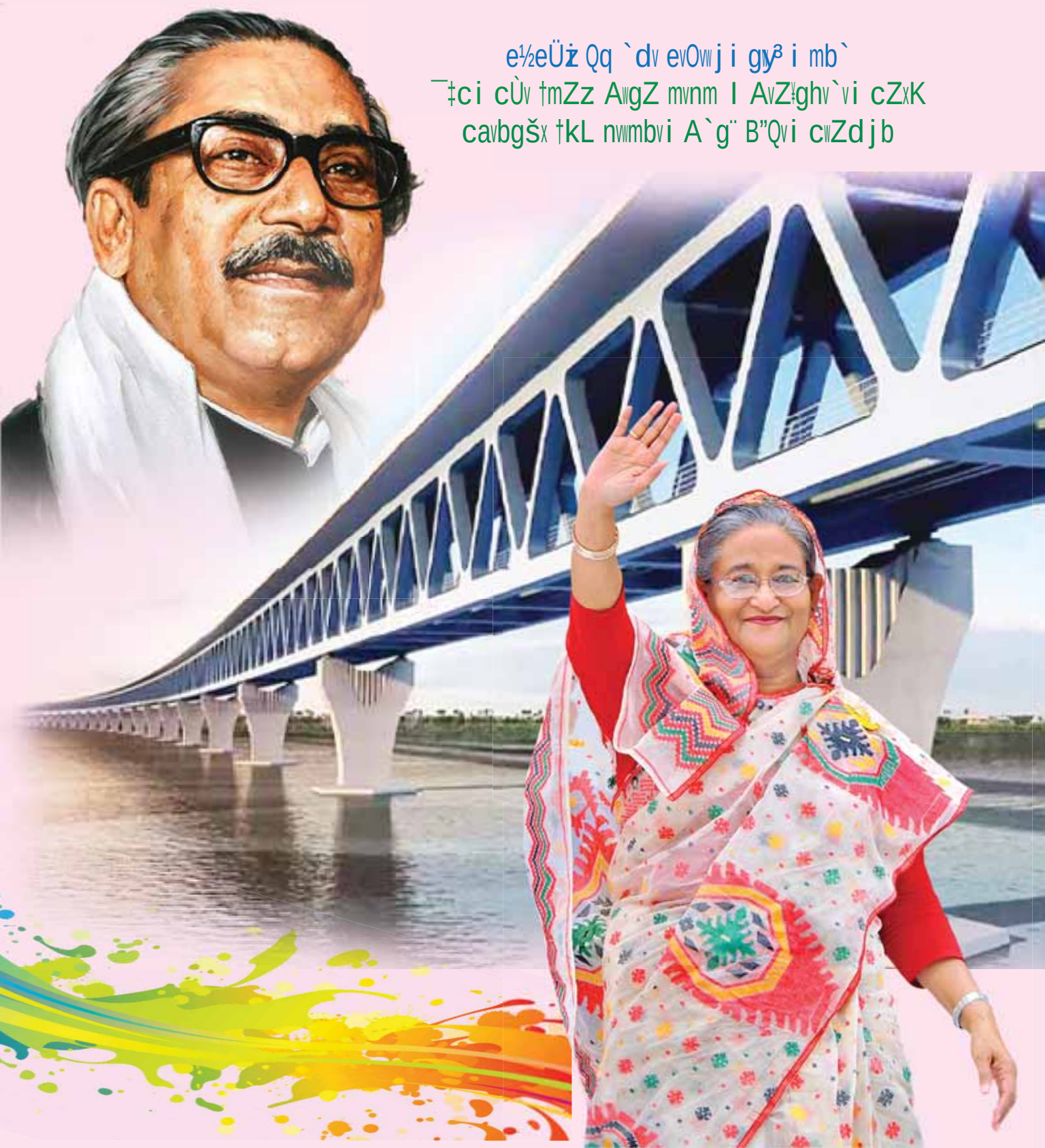

e½eÜzi Qq `dv evOvwji gyw³i mb`
¯‡ci cÙv †mZz AwgZ mvnm I AvZ¥ghv©`vi cZxK
cavbgš¿x †kL nvwmbvi A`g¨ B”Qvi cwZdjb

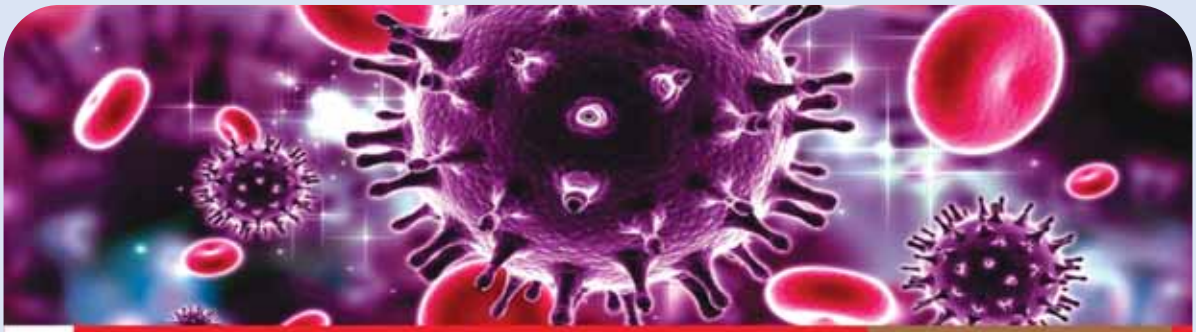

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

Pjw”PÎ I cKvkbv Awa`ßi, Z_¨ I m¤úPvi gšYvjq

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুন ২০২২ ❑ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৯

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই জুন ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস' উপলক্ষে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

সাতই জুন ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ। ১৯৬৬ সালের এই দিনে ছয় দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলনের সূচনা হয়। এই দিন আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে তৎকালীন পুলিশ ও ইপিআরের গুলিতে ১১ জন বাঙালি শহিদ হন। পরবর্তীতে ছয় দফাভিত্তিক বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নেয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ছয় দফার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ছয় দফা দিবস উপলক্ষে *সচিত্র বাংলাদেশ* জুন ২০২২ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

৩১শে মে বিশ্বজুড়ে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হয়। বর্তমানে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হিসেবে বিবেচিত হয় তামাক। মানুষকে তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে এবং স্বাস্থ্যের ওপর তামাকের নেতিবাচক প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দিবসটি পালন করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Tobacco: threat to our environment'। বাংলাদেশের চার কোটির বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অফিস, বাড়ি কিংবা খোলা জায়গায় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়। মানুষের জীবন বাঁচাতে তামাকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে ৩০শে মে ২০২২ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে বিশেষ সেমিনার আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন।

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশ দূষণের ফলে মানব সভ্যতা প্রতিমুহূর্তে হুমকির মুখে পড়ছে। পরিবেশ সংরক্ষণে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধুর বহুমুখী ভাবনা ও সময়োপযোগী উদ্যোগ নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সুস্থ শরীর গঠনের মূল চাবিকাঠি যোগ ব্যায়াম। মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিধানের জন্য সামগ্রিক পদ্ধতির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দিবসটি পালন করা হয়। করোনা মহামারির বিরুদ্ধে যেহেতু মানুষকে এখনও লড়াই করে যেতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে যোগব্যায়াম সংক্রমণমুক্ত শারীরিক গঠন তৈরিতে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রয়েছে নিবন্ধ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন স্বপ্নের পদ্মা সেতুর শুভ উদ্‌বোধন করবেন। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ আমাদের সক্ষমতার প্রতীক ও মর্যাদার প্রতীক। পদ্মা সেতু নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ। জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বাবা দিবস উপলক্ষ করে রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা। এছাড়া গল্প, কবিতা, প্রতিবেদনসহ অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে এ সংখ্যা।

আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ছয় দফা আন্দোলন ও স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম ৪
ড. মো. আব্দুস সামাদ

পদ্মা সেতু উন্মুক্ত করবে উন্নয়নের সুবর্ণ দ্বার ৮
মো. আবু নাছের

বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে শেখ হাসিনার পদ্মা সেতু ১০
ইয়াকুব আলী

আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিং এবং মেরিলিন মনরো ১৩
মো. রফিকুজ্জামান

মানব কল্যাণে যোগ ১৬
শচীন্দ্র নাথ হালদার

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনা সরকারের অনন্য অবদান ১৮
মোতাহার হোসেন

পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধুর বহুমুখী ভাবনা ও সময়োপযোগী উদ্যোগ ২০
নাজমুল হুদা

পরিবেশ-প্রতিবেশ সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ: এখনই সময় ২২
মরজিনা ইয়াসমিন

স্টেম (STEM) শিক্ষা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ২৪
মো. রেজুয়ান খান

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা: বাঙালির মুক্তির সনদ ২৬
কে সি বি তপু

শহিদ জননী জাহানারা ইমাম আমাদের অহংকার ২৯
রহিমা আক্তার মৌ

পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা জরুরি ৩১
আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

তথ্য আন্দোলনের অপরিহার্যতা ৩২
প্রাচ্য পলাশ

কন্যাশিশুর বিয়ে প্রতিরোধ করুন ৩৪
আনোয়ারা আজাদ

ইভটিজিং প্রতিরোধে সরকারের কার্যক্রম ৩৫
সুরাইয়া শিমুল

গল্প

মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরি ৩৭
অমিত কুমার কুণ্ডু

কবিতাগুচ্ছ

৩৯-৪৩

খান আসাদুজ্জামান, রীনা তালুকদার, জাহানারা জানি, আমীরুল ইসলাম, ইমরান পরশ, মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ, কাব্য কবির, দেলওয়ার বিন রশিদ, অতনু তিয়াস, মঈনুল হক চৌধুরী, বোরহান মাসুদ, রাজিয়া রহমান, প্রজীৎ ঘোষ, সোহেল রানা, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, রকিবুল ইসলাম, ফওজিয়া হুদা, আবু মুসা চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৪
প্রধানমন্ত্রী ৪৫
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৪৬
আন্তর্জাতিক ৪৭
উন্নয়ন ৪৮
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৪৯
শিল্প-বাণিজ্য ৫০
শিক্ষা ৫১
বিনিয়োগ ৫২
নারী ৫২
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৩
কৃষি ৫৩
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৪
স্বাস্থ্যকথা ৫৫
নিরাপদ সড়ক ৫৬
বিদ্যুৎ ৫৬
যোগাযোগ ৫৭
কর্মসংস্থান ৫৮
সংস্কৃতি ৫৮
চলচ্চিত্র ৫৯
মাদক প্রতিরোধ ৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
প্রতিবন্ধী ৬১
ক্রীড়া ৬২

শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন অমর একুশে গানের রচয়িতা, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ৬৩

হাইলাইটস

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ

ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ। পূর্ব পাকিস্তানের জননন্দিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে লাহোরে ছয় দফা ঘোষণা করেন। এই ছয় দফাকে বাংলার জনগণের বাঁচার গণদাবিতে রূপান্তরিত করেন বঙ্গবন্ধু। ছয় দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। ছয় দফার জনপ্রিয়তা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে ভাবিয়ে তোলে। ছয় দফা প্রচারকালে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। ছয় দফা বাস্তবায়ন এবং বঙ্গবন্ধুসহ নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। হরতালে নির্বিচারে গুলি চালায় ও লাঠিপেটা করে পুলিশ ও ইপিআর। টঙ্গি, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে মনু মিয়া, শফিক, শামসুল হকসহ ১১ জন বাঙালি শহিদ হন। এর পর থেকেই ৭ই জুন 'ছয় দফা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ছয় দফা বাঙালি জাতীয়তাবাদে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে। ৭ই জুনের সফল হরতালে আতঙ্কিত হয়ে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। উনসত্তরের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান এ চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়। এর পর ছয় দফা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আসে সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন, ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা ঘোষণা, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের বিজয় অর্জন। ঐতিহাসিক ছয় দফা নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ছয় দফা আন্দোলন ও স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম' ও 'বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা : বাঙালির মুক্তির সনদ' শীর্ষক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা–৪ ও ২৬

স্বপ্নের পদ্মা সেতু : অমিত সাহস ও আত্মমর্যাদার প্রতীক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অদম্য ইচ্ছার প্রতিফলন

পদ্মা সেতু আর স্বপ্ন নয়। স্বপ্নের বাস্তবায়ন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও বঙ্গবন্ধুর মতো একজন দূরদর্শী নেতা। তিনিই পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ বাস্তবায়ন করেছেন। দেশের সকল অঞ্চলকে অভিন্ন সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এনে উন্নয়নের গতি বেগবান করতে শেখ হাসিনা সরকার ২০০১ সালে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে সেতু নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করে। এরপর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাওয়াপ্রান্তে ২০০১ সালের ৪ঠা জুলাই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০৮ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। ১২ই ডিসেম্বর ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাজিরা এবং মাওয়াপ্রান্তে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে নদীশাসন এবং মূল সেতুর নির্মাণকাজের সূচনা করেন। তথাকথিত দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্বব্যাংক ঋণচুক্তি স্থগিত করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন পদ্মা সেতু অবশ্যই হবে নিজস্ব অর্থায়নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চ্যালেঞ্জ এবং সাহসী ঘোষণায় উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ। পদ্মা সেতু প্রধানমন্ত্রীর অদম্য ইচ্ছার প্রতিফলন, যা বীর বাঙালির অমিত সাহস ও আত্মমর্যাদার প্রতীক। স্বপ্নের এ সেতুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন করবেন। পদ্মা সেতু নিয়ে 'পদ্মা সেতু উন্মুক্ত করবে উন্নয়নের সুবর্ণ দ্বার' এবং 'বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে শেখ হাসিনার পদ্মা সেতু' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা– ৮ ও ১০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ছয় দফা আন্দোলন ও স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম

ড. মো. আব্দুস সামাদ

> সৃষ্টিকর্তা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র। মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যদি না থাকত আমাদের যা কিছু অর্জন বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম, উদ্ভাবন, সবই ভূলুণ্ঠিত হতো। রাষ্ট্র কাঠামো আছে বলেই সবগুলো রক্ষিত হচ্ছে। যেটা আজকের বাংলাদেশ, এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন রকমের রাজা ছিল, সামন্তবাদী জমিদার ছিল, ভূঁইয়ারা ছিল, এমন বহু কিছু ছিল, কিন্তু এই অঞ্চল কখনো একটা আধুনিক রাষ্ট্র হবে সেটা কখনো কেউ চিন্তা করেনি। একটি স্বাধীন সার্বভৌম আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি করে দিয়ে গেছেন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বিংশ শতকের ষাটের দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করে। জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধ আন্দোলন এক নতুন মাত্রায় উপনীত হয়, যা ছিল গুণগত পরিবর্তনেরও ইঙ্গিতবাহী। আর তা হলো– ভাষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক যে আন্দোলন মধ্য পঞ্চাশে রাজনৈতিক রূপ নিয়েছিল, ষাটের দশকে এসে তা অর্থনৈতিক মাত্রা অর্জন করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে এই দলকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষাবলম্বী করে তোলেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর এক নতুন বাস্তবতায় ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা উত্থাপন করে বাঙালিদের মূল নেতায় পরিণত হন। ফলে ছেষট্টির পরে দ্রুততার সাথে পাঁচ বছরের মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ধাপে ধাপে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দেয়।

বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রামের এ পরম্পরা ও গৌরব আমাদের সামগ্রিক চেতনার অন্তর্গত। এ ঘটনাপ্রবাহ আমাদের অস্তিত্বের শিকড়কে স্পর্শ করেছিল। আমাদের বর্তমানকে আন্দোলিত করেছে এবং একইভাবে ভবিষ্যৎকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। এ মহাবিবরণীর (Grand Narrative) সঙ্গে বহু মনের আবেগ জড়িত, কিন্তু ইতিহাস লিখতে হবে আবেগমুক্ত হয়ে। সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং পূর্ববর্তী ইতিহাসের কার্যকারণ সূত্রে বিন্যস্ত হবে এ ইতিহাস। সুতরাং অনেক বড়ো পরিসরে দেখতে হবে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা কখনো সম-অধিকার ভোগ করতে পারেনি। শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসনের (Internal Colonial Rule) শিকার হয়। ঐ রাষ্ট্রে বাঙালিদের সমস্যার প্রকৃতি ছিল জাতিসত্তাগত। এটি যথাযথভাবে চিহ্নিত করেই আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিরোধী দলের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ঐ সম্মেলনে ৫ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা পেশ করেন। ছয় দফার ভেতরে ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালির অধিকারের দাবি। এসব দাবি দ্রুত বাঙালির মধ্যে জাতীয় মুক্তির জন্য নবচেতনা জাগিয়ে তোলে।

ছয় দফার পটভূমি

> বঙ্গবন্ধুকে অন্নদাশঙ্কর রায় প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এল।' 'শুনবেন?' তিনি (মুজিব) মুচকি হেসে বললেন, 'সেই ১৯৪৭ সালে। আমি সুহরাবর্দী (সোহরাওয়ার্দী) সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালীর একদেশ। বাঙালীরা এক হলে কী না করতে পারত। সারা জগৎ জয় করতে পারত। They could conquer the world.' বলতে বলতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। তারপর বিমর্ষ হয়ে বললেন, 'দিল্লী থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সুহরাবর্দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজী নয় তাঁদের প্রস্তাবে। তাঁরা হাল ছেড়ে দেন। আমিও দেখি যে আর কোনো উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে আরম্ভ করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু, আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা।'

ছয় দফা আন্দোলনের প্রথম দফাটি ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র করা হবে। আর এটাকে কেটে একটা রাষ্ট্র করা হলো। প্রত্যেকটা স্টেটকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। সেটা ছিল ছয় দফা। বাঙালির জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার পক্ষে *আমাদের বাঁচার দাবি* পুস্তিকায় জনগণের উদ্দেশে বলেন–

> অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখন উঠিয়াছে তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈচৈ করিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুক্তির সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভের মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। আমার

প্রস্তাবিত ছয় দফা দাবিকেও তেমনিভাবে পাকিস্তানকে দুই টুকরা করবার দুরভিসন্ধি আরোপ করতেছেন।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পরে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনের ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করল। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পুরানো অভিযোগের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হলো নিরাপত্তার ব্যাপারে চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্যের অভিযোগ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ এ ইস্যুতে সোচ্চার হলেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ভারত যুদ্ধের অবসান হয় 'তাসখন্দ চুক্তির' মাধ্যমে। আইয়ুব এবং ভুট্টো আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তাসখন্দ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ চুক্তি তারা মনেপ্রাণে মেনে নেননি। পশ্চিম পাকিস্তানে চুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে এ চুক্তি অভিনন্দিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর তাসখন্দ চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলে তিনি এক আন্তরিকতাপূর্ণ শোকবাণী পাঠান। এসব আলামত পাকিস্তান সরকারের ভালো লাগেনি। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পুরানো মামলা-মোকদ্দমা এসময় নতুন উদ্যমে জাগিয়ে তোলা হয় এবং তাঁকে নানাভাবে হয়রানি করা হতে থাকে।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী নেতারা তাসখন্দ-উত্তর রাজনীতির গতিধারা নিরূপণের জন্য লাহোরে ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি এক জাতীয় কনফারেন্স আহ্বান করেন। ইসলামপন্থি দলগুলো (জামায়েত ইসলামি, নেজামে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ) এতে যোগ দেয়। কিন্তু এন.ডি.এফ. ও ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আইয়ুববিরোধী হলেও সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা আহুত এ সম্মেলনে যোগ দেয়নি, শেখ মুজিবুরও প্রথমে যেতে চাননি। দলীয় আলোচনার পর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সামনে পূর্ব পাকিস্তানের দাবিগুলো তুলে ধরার সুযোগ লাভের আশায় লাহোর কনফারেন্সে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। প্রস্তুতিস্বরূপ এসময়েই (জানুয়ারি ১৯৬৬-এর শেষ সপ্তাহে) মুজিবুর ছয় দফার খসড়া প্রস্তুত করেন।

আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিয়ে শেখ মুজিবুর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি লাহোর যান এবং পরদিন সাবজেক্ট কমিটির মিটিংয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দাবি হিসেবে 'ছয় দফা' পেশ করেন এবং এগুলো কনফারেন্সের আলোচ্যসূচিতে গ্রহণ করার জন্য চাপ দেন। কিন্তু লাহোর কনফারেন্স আসলে ছিল একটি ভারতবিরোধী সাম্প্রদায়িক সমাবেশ, যার মূল লক্ষ্য ছিল কাশ্মীর নিয়ে রাজনীতি করা। তাই তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরদিন পশ্চিম পাকিস্তানি পত্রপত্রিকায় ছয় দফার বিকৃত বিবরণ ছাপিয়ে শেখ মুজিবুরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপে চিত্রিত করা হয়। ফলে মুজিবুর ৬ই ফেব্রুয়ারির মূল কনফারেন্সে যোগ না দিয়ে তিনি কয়েক দিন পর ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ফিরে আসেন। কনফারেন্সে পাকিস্তানে আইয়ুব শাহীর পরিবর্তে ইসলামি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার এবং তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা করে কাশ্মীর পুনরুদ্ধারের সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কোনো সমস্যা আলোচকদের বিবেচনাতেই আসেনি। এ সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে দলমতনির্বিশেষে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল রাজনীতিকই সমান সহানুভূতিহীন ও সন্দেহপ্রবণ।

১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে 'ছয় দফা' প্রস্তাব ও তার জন্য আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এসময় শেখ মুজিবুর ও তাজউদ্দীন আহমদের দুটি ভূমিকাসহ ছয় দফা বিবৃত করে একটি বই প্রকাশ করা হয়। এরপর ১৮ই মার্চ তারিখে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বনামে *আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি* শীর্ষক আর একটি বই প্রচার করা হয়। এ বইয়ে ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এতে বলা হয় যে, গত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই ছয় দফার পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। 'ছয় দফা' ও তার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যবাদী জাতীয় আন্দোলন হচ্ছে ১৯৬৫-এর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক পরিণামফল। *আমাদের বাঁচার দাবি* বইয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে আইয়ুব খান বা তার সরকারের উল্লেখ না করে সর্বত্র পশ্চিম পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের উল্লেখ করে তাদের সঙ্গেই পূর্ব পাকিস্তানের বোঝাপড়ার অবতারণা করা। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য এক সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের ভাব ও ভাষা ফুটে উঠেছিল।

সংক্ষেপে ছয় দফা

১। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সংসদ ও রাজ্য পরিষদসমূহ সার্বভৌম হবে।

২। ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়– প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র সম্পর্ক।

৩। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। মুদ্রা ব্যবস্থা আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা স্টেট ব্যাংক থাকবে। অথবা সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রা ব্যবস্থা

থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।

৪। সবরকম কর ও শুল্ক ধার্য করা ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। তবে রাজ্যের আদায়কৃত অর্থের কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অংশ থাকবে এবং আদায়ের সাথে সাথেই সে অংশটুকু ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। এ টাকাতেই ফেডারেল সরকার চলবে।

৫। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে।

৬। প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা-সামরিকবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।

১৯৬৫-এর যুদ্ধের পটভূমিতে উদ্ভূত 'ছয় দফা' পূর্ব পাকিস্তানের আগের সকল আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন ছিল। 'ছয় দফা' এমন এক নতুন আন্দোলনের জন্ম দিলো যার লক্ষ্যই পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন আদায়। *আমাদের বাঁচার দাবি* বইয়ে শেখ মুজিবুর পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষের স্বার্থসমূহ রক্ষা তথা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা কিছু ইংরেজি কিছু আরবি মিশ্রিত সরল ও সাধু বাংলায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। সাধারণ বাঙালি মুসলমানের ভাবভঙ্গি অনুসরণ করে শেষের দিকে দুই-একবার আল্লাহর নাম উল্লেখ করেছেন বটে, তবে রাজনৈতিক দলিল হিসেবে লেখাটি সেক্যুলার ও যুক্তিসমৃদ্ধ। এ বইতে শেখ মুজিবুর লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) এবং একুশ দফা (১৯৫৪)-ও উল্লেখ করেছেন। ছয় দফা রচনায় ঐ দুই দলিলের প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে ছয় দফার পূর্ববর্তী আন্দোলনসমূহ ছিল পাকিস্তানের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। বইয়ে শেখ মুজিবুর ছয় দফাকে 'গোটা পাকিস্তানের বাঁচার দাবি' বললেও পাকিস্তানের সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানের এলিট শ্রেণি একে পাকিস্তান ভাঙার অস্ত্র হিসেবেই দেখেছিল এবং সেভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। এর ফলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ছয় দফার প্রতিক্রিয়া

১১ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফেরার পর থেকেই শেখ মুজিবুর ছয় দফার পক্ষে প্রচার চালাতে থাকেন। পরবর্তী নয় মাস যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে গণসংযোগ ও জনসভায় ভাষণের মাধ্যমে এ প্রচার চালান। অপরদিকে সরকার এবং ছয় দফার অন্যান্য বিরোধীরা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চরম প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য দেওয়া অব্যাহত রাখেন। শেখ মুজিবুরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি করাচিতে পূর্ব পাকিস্তানের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল হাই চৌধুরী ছয় দফার আন্দোলনকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা' বলে অভিহিত করেন। মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে এসে স্বয়ং আইয়ুব খান ছয় দফা ও তার প্রবক্তার বিরুদ্ধে প্রচারে নামেন। ১৬ই মার্চ রাজশাহীতে তিনি বলেন যে, ছয় দফা 'হিন্দু আধিপত্যাধীনযুক্ত বাংলা' গঠনের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয় এবং এটা বাস্তবায়িত হলে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা পশ্চিম বাংলার বর্ণ হিন্দুদের গোলামে পরিণত হবে। মুজিবুর যখন ছয় দফার 'বলটি' পাকিস্তানের রাজনৈতিক মাঠে ছুড়ে দিলেন তখনই আইয়ুবসহ বাকি সকলেই সেটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত এটাই হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তানের রাজনীতির 'ফাইনাল' খেলা। ১৯৪০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পঁচিশ বছরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম হয়েছিল ছয় দফা যা বাঙালির বিপন্ন মনের কাছে এক লাগসই ফর্মুলা বলে উপস্থাপিত হয়েছিল। ব্যাপক জনসমর্থনের ফলে এটি হয়ে দাঁড়াল এক মহাঅস্ত্র। আর এ অস্ত্র প্রয়োগ করেই বাঙালি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একই দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর জনগণকে তাদের ন্যায্য ছয় দফা দাবি আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরকে তার সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানের ছয় দফার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে নানা অজুহাতে মুখোমুখি বাগযুদ্ধ এড়িয়ে যান। এদিকে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ভুট্টো ও আইয়ুব খানকে পূর্ব পাকিস্তানে 'ছয় দফা'র ওপর গণভোট অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান। তারও কোনো জবাব কখনো পাওয়া যায়নি।

ছয় দফার জনপ্রিয়তা এবং সরকারের দমননীতি

পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ এর সমর্থনে বিবৃতি দেন। সর্বজনমান্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম ২৬শে মার্চ (১৯৬৬) তারিখে সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে ছয় দফাকে লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেন এবং আইয়ুব খানকে ছয় দফার ব্যাপারে 'অস্ত্রের ভাষা' ত্যাগ করে 'যুক্তির ভাষায়' কথা বলতে পরামর্শ দেন। আইয়ুব খান দমননীতির পথই বেছে নিলেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই প্রধান শত্রু বলে শনাক্ত করলেন। এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত হয়রানি। পুরানো মামলা-মোকদ্দমা জোরদার করা ছাড়াও বহু নতুন মামলায় তাঁকে জড়ানো হলো। বিভিন্ন জেলায় ছয় দফার অনুকূলে জনসভায় তাঁর দেওয়া বক্তৃতায় উচ্চারিত বক্তব্যের ওপর তাঁকে বার বার গ্রেপ্তার-জেল-জামিনের 'চরকিপাকে' ঘোরানো হতে লাগল। অবশেষে ৮ই মে (১৯৬৬) তারিখে নারায়ণগঞ্জে কয়েকজন সঙ্গীসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির (Defence of Pakistan Rules) ৩২ (১)-ক ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশজুড়ে ছয় দফা সমর্থকদের ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে বিরাট বিক্ষোভ দেখা দেয়।

সরকারের দমননীতি এবং নির্বিচারে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৩ই মে পূর্ব পাকিস্তানে 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয়। প্রদেশের নানা স্থানে হরতাল, মিছিল ও জনসভা হয়। ঢাকায় পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় ছয় দফা গণ-অনুমোদন পায়। এরপর গ্রেপ্তার করা হয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে। ২০শে মে অনুষ্ঠিত সভায় ৭ই জুন তারিখে আওয়ামী লীগ প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এদিকে পঁয়ষট্টির যুদ্ধের সময় থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যাভাব চলে

আসছিল। ১৯৬৬ সালে খাদ্যাভাব, বেকার সমস্যা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামের ঊর্ধ্বগতি সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। ছয় দফার প্রতি জনগণের সমর্থন বেড়েই চলে এবং ৭ই জুনের হরতাল সফল হওয়ার স্পষ্ট সম্ভাবনা দেখা যায়। ফলে মোনেম খানের প্রাদেশিক সরকার এ হরতাল ব্যর্থ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। হরতালের প্রচারপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং অনেক প্রচারকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২রা জুন আওয়ামী লীগের আরও নয় জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গভর্নর মোনেম খান আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে হরতালে সাড়া না দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এবং হরতালকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান দমননীতির বিরুদ্ধে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন।

জুনের পাঁচ তারিখে নুরুল আমীন পুনরায় সরকারি দমননীতির সমালোচনা করেন। ৬ই জুন প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গভর্নরের বাজেট বক্তৃতা বর্জন করেন। ৭ই জুন সরকার ও বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে এক শক্তি পরীক্ষার দিন হিসেবে প্রতিভাত হয়। সরকারের বিভিন্ন নির্যাতনমূলক তৎপরতা সত্ত্বেও ৭ই জুন গোটা পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ধর্মঘট হিংসাত্মক রূপ নেয়। ধর্মঘটী জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালালে এগারো জন নিহত ও বহু আহত হয় এবং আটশো লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের পর থেকে আন্দোলন তীব্রতর হয় এবং তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আইয়ুব খানের পতন ঘটে।

৮ই জুন (১৯৬৬) পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ৭ই জুনের ঘটনা নিয়ে আলোচনার আবেদন স্পিকার নাকচ করলে সকল বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্য ওয়াকআউট করেন। ১৭ থেকে ১৯শে জুন পর্যন্ত তিন দিন পূর্ব পাকিস্তানে 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করা হয়। ৭ই জুনের ঘটনাবলি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছিল। এর পরিবর্তে খবরের কাগজগুলোতে ৮ই জুন প্রকাশ হয়েছিল সরকারি প্রেসনোট। তবে 'অনিবার্য কারণে' সংবাদদাতাদের দেওয়া হরতালের রিপোর্ট ছাপানো গেল না' বলে নোটিশ ছেপেছিল কাগজগুলো। পরে ১৬ই জুন তারিখে আওয়ামী লীগপন্থি দৈনিক *ইত্তেফাক* সম্পাদকীয় নিবন্ধে ৭ই জুনের ঘটনাবলির কিছু কিছু উল্লেখ করলে সরকার সাথে সাথে কাগজের ঐ সংখ্যাটির সকল কপি বাজেয়াপ্ত করে এবং সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিতে গ্রেপ্তার করে। *ইত্তেফাক*, *Times (Dhaka)* ও *পূর্বাণীর* ছাপাখানা 'নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস'ও একই দিনে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। ১৮ই জুন এ ব্যাপারে প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের মুলতবি প্রস্তাব ও অধিকার প্রস্তাব স্পিকার নাকচ করলে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা আবারও ওয়াকআউট করেন। সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা ২০শে জুন ধর্মঘট পালন করেন। নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াপ্ত ঘোষণাকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হলে সরকার হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে পরাজিত হয়। সরকারের অব্যাহত দমননীতির কারণে সাংবাদিক ও রাজনৈতিকসহ অনেকেই গ্রেপ্তার হন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব একাধিকবার ছয় দফার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখেন।

ছয় দফার তাৎপর্য ও গুরুত্ব

ঐতিহাসিকদের মতে, ছয় দফা ঘোষণার পর পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে ছয় দফার প্রশ্নে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকেন। ক্রমাগতভাবে ছয় দফা জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পটভূমিতে বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রাম নতুন মাত্রা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার অবিসংবাদিত জননেতা হয়ে ওঠেন। ছয় দফায় প্রত্যক্ষভাবে বাঙালিদের স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি কিন্তু এর ভেতরে বাঙালির জাতীয় মুক্তির বীজ নিহিত ছিল। ছয় দফা কেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ বেয়েই জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

কোনো দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিপুল মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার চাপ ও বিদ্যমান ঘটনাপ্রবাহের মিথস্ক্রিয়া কোনো দূরদর্শী ও গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাকে মূলধারার মুখপাত্র বা মুখ্য চরিত্র করে তোলে; অথবা কোনো দমিত, দলিত, নিগৃহীত জাতির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্যারিশম্যাটিক মূল নেতাই জনগণের মানসচেতনার স্তর ও বাস্তবিক ভেতর তাগিদের সঙ্গে নিজস্ব বোধ-বিশ্বাস-ধারণা-বিবেচনা ও সময়জ্ঞানকে অন্বিত করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কে পরিণত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আহাদ, অলি (১৯৮৪), *জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫-১৯৭৫)*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি।

২। খান, জিল্লুর রহমান (২০১৪), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৩। খান, তারিক হোসেন (২০১৮), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বুকস ফেয়ার (২০১৯)।

৪। খান, রাও ফরমান আলী (২০০৭), *বাংলাদেশের জন্ম*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

৫। ঘোষ, শ্যামলী (২০০৯), *আওয়ামী লীগ*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

৬। চ্যাটার্জী, জয়া (২০০৭), *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ, ১৯৩২-১৯৪৭* (অনুবাদ: আবু জাফর), ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

৭। চৌধুরী, আফসান (২০০৭), *বাংলাদেশ ১৯৭১ (প্রথম খণ্ড)*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদ্রার্স।

৮। চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (২০১১), *বাঙালি জাতীয়তাবাদ* (তৃতীয় সংস্করণ), ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

৯। জামিল, শাফায়েত (১৯৯৮), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ: রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

১০। রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৭৫), *শোষিতের গণতন্ত্র চাই*, ২৬শে মার্চ ১৯৭৫ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা, ঢাকা: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়।

১১। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২), ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১২। *কারাগারের রোজনামচা* (২০১৭)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

১৩। *আমার দেখা নয়া চীন* (২০২০)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

১৪। Sisson, Richard and Rose, Lio (1990). *War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh*. California: University of California Press.

ড. মো. আব্দুস সামাদ : সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

পদ্মা সেতু উন্মুক্ত করবে উন্নয়নের সুবর্ণ দ্বার

মো. আবু নাছের

পদ্মা সেতু আজ আর স্বপ্ন নয়, দৃশ্যমান বাস্তবতা। প্রমত্তা পদ্মার উপর নির্মিত হয়েছে স্বপ্নের সেতু। এ সেতু বাংলাদেশের সামর্থ্যের প্রতীক। সাহসী এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতীক। বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন থেকে সরে গেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত সাহসের সাথে দেশের নিজস্ব অর্থায়নে এ সেতু নির্মাণ প্রকল্প এগিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেন। তাঁর এ সাহসী সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে দোলাচল কাটিয়ে এগিয়ে চলে সেতুর নির্মাণকাজ। আশা জাগানিয়া পদ্মা সেতু উন্মোচন করতে যাচ্ছে সাফল্য আর সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। উন্নয়নের সূচকে যোগ করতে যাচ্ছে নবমাত্রা। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের কর্মযজ্ঞ। পদ্মার দুপাড়ে সাজ সাজ রব। দেশজুড়ে অধীর অপেক্ষা। অপেক্ষা আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, সুষম উন্নয়ন যাত্রার পাশাপাশি এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের সাথে সংযোগ রক্ষায় এ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সরকার। আশা করা যাচ্ছে, এর ফলে দেশের জিডিপি শতকরা ১ দশমিক ২৩ ভাগ বৃদ্ধি পাবে এবং আঞ্চলিক জিডিপি বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হবে শতকরা ২ দশমিক ৩ ভাগ। প্রতিবছর শতকরা দশমিক ৮৪ ভাগ হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সেতুর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে যাচ্ছে। এর ফলে দেশে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে।

নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৩০ হাজার ১ শত ৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বৃহত্তম অবকাঠামো প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগ। এর মধ্যে মূল সেতুর অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা। পদ্মা একটি ভাঙনপ্রবণ নদী। এ নদীর বহমানতা এবং ভাঙন নিয়ে পূর্বাভাস অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তাই সেতুর দুপ্রান্ত মাওয়া ও জাজিরা এলাকায় নদীশাসন কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রায় ৮ হাজার ৯ শত ৭২ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে নদীশাসন কাজে।

দেশের সকল অঞ্চলকে অভিন্ন সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এনে উন্নয়নের গতি বেগবান করতে শেখ হাসিনা সরকার ২০০১ সালে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে সেতু নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করে। এরপর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাওয়াপ্রান্তে ২০০১ সালের ৪ঠা জুলাই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০৮ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। ১২ই ডিসেম্বর ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাজিরা এবং মাওয়াপ্রান্তে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে নদীশাসন এবং মূল সেতুর নির্মাণ কাজের সূচনা করেন। এ সেতুতে স্থাপন করা হয়েছে গ্যাস সরবরাহের পাইপ লাইন এবং অপটিক্যাল ফাইবার লাইন। সেতুর পাশ দিয়ে স্থাপন করা হচ্ছে বিদ্যুৎ সংযোগ লাইন। একশ বছরের স্থায়িত্বের লক্ষ্য নিয়ে নির্মিত এ সেতুর রয়েছে রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পের সহনশীলতা।

প্রমত্তা পদ্মার বুক চিরে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মা সেতু। দোতলা সেতুর নিচতলা দিয়ে চলবে ট্রেন এবং উপরে মোটরগাড়ি। সেতু দিয়ে ঘণ্টায় ১ শত ৬০ কিলোমিটার বেগে যাত্রীবাহী ট্রেন এবং

ঘণ্টায় ১ শত ২০ কিলোমিটার বেগে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের উপযোগী রেলট্র্যাক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ডাবল কনটেইনার ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিদিন ৮০টি ট্রেন সেতুর উপর দিয়ে উভয় দিকে চলাচলের সক্ষমতা নিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে রেলট্র্যাক। এলক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় আলাদা প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করছে।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের বাজারমূল্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। সাতটি পুনর্বাসন এলাকা নির্মাণের মাধ্যমে যারা বাড়িঘর হারিয়েছেন তাদের মাঝে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আবাসিক প্লট। বাণিজ্যিক প্লট ছাড়াও দেওয়া হয়েছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ। দেওয়া হয়েছে বাণিজ্যিক প্লট। সামাজিক অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় পুনর্বাসনের পাশাপাশি নানারকম বৃত্তিমূলক কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পুনর্বাসন এলাকায় বসতবাড়ির জন্য প্লট বরাদ্দ ছাড়াও নির্মাণ করা হয়েছে স্কুল, ক্লিনিক, মসজিদ, পুকুর ও বাজার। এছাড়া মার্কেট শেড, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ওভারহেড ট্যাংক, মিশ্র ফলের বাগান, খেলার মাঠ, পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ড্রেন, সীমানা প্রাচীরসহ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা। নিশ্চিত করা হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা। পরিবেশ সুরক্ষায় ২০১২ সাল থেকে প্রকল্প এলাকায় বনায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এরই মাঝে প্রায় দুই লাখ গাছ রোপণ করা হয়েছে। বন বিভাগের মাধ্যমে চারটি পুনর্বাসন এলাকায় লাগানো হয়েছে গাছের চারা। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অভয়ারণ্য তৈরি করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাথে যৌথ উদ্যোগে স্থাপন করা হয়েছে জাদুঘর।

পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সাথে সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। বিভাগীয় শহর খুলনা ও বরিশাল, বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন, সাগরকন্যা হিসেবে পরিচিত কুয়াকাটা, দেশের ২য় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মোংলা, পায়রা সমুদ্রবন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর বেনাপোল ও ভোমরা নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই এ অঞ্চলের যোগাযোগ অবকাঠামোকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের আওতায় নিয়ে এসেছে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ।

একথা স্বীকৃত সত্য যে, উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার দেশের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে নিয়েছে ব্যাপক উদ্যোগ। এসকল উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। পদ্মা সেতু ঘিরে সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক পরিকল্পনা। এরই মাঝে রাজধানীর যাত্রাবাড়ি থেকে মাওয়া এবং পাচ্চর থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ দৃষ্টিনন্দন দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-যশোর থেকে বেনাপোল পর্যন্ত যাতায়াত নিরবচ্ছিন্ন করতে মধুমতী নদীর উপর নির্মাণ করা হচ্ছে কালনা সেতু। এ সেতুর কাজ শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে। এরই মাঝে এ মহাসড়কে ঝিকরগাছা সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। কালনা সেতুর কাজ শেষ হলে ঢাকা থেকে বেনাপোল স্থলবন্দর পর্যন্ত বিরামহীন সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

এদিকে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবির অর্থায়নে দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ছয় লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সাপোর্ট প্রকল্প হিসেবে ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে ভূমি অধিগ্রহণে এবং ইউটিলিটি শিফটিং-এর কাজ চলছে। অপরদিকে যশোর-খুলনা-মোংলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার সাথে সাথে পর্যটনের অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে। সুন্দরবন এবং কুয়াকাটার যোগাযোগ সহজতর হবে। গড়ে উঠবে আধুনিক মানের হোটেল-রিসোর্ট। পদ্মা সেতুকে ঘিরে পদ্মার দুই পাড়ে সিঙ্গাপুর ও চীনের সাংহাই নগরের আদলে আধুনিক শহর গড়ে উঠতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য অল্পসময়ে এবং কমখরচে ঢাকায় চলে আসবে। কৃষি-শিল্প-অর্থনীতি-শিক্ষা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে এ সেতুর বিশাল ভূমিকা থাকবে।

সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে পদ্মা সেতু। এ সেতুকে ঘিরেই আবর্তিত হবে আগামী দিনের উন্নয়ন। বদলে যাবে নদী-মেখলা সবুজ শ্যামল প্রিয় বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে রং-রূপ বদলে যেতে শুরু করেছে। পার্শ্ববর্তী এলাকা, নদী তীরের মানুষের জীবনধারায় ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হতে শুরু করেছে। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার সিঁড়ি বেয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নে এ সেতু হবে অন্যতম চালিকাশক্তি। উন্নয়নের সোপান। সামর্থ্যের সোনালি ঠিকানা। স্বপ্নের এ সেতুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ।

মো. আবু নাছের: উপসচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, nasertipu007@gmail.com

বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে শেখ হাসিনার পদ্মা সেতু

ইয়াকুব আলী

ডিসেম্বর ১৯৯৬। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকায় ফিরছিলাম। তখন তো মোবাইল ছিল না। হাতে ঘড়িও ছিল না। কাজলা গেট থেকে বিকেলে রওনা করে নগরবাড়ি ঘাটে পৌঁছার পর এশার আজান হয়। ঘাটে বাস-ট্রাকের দীর্ঘ সারি। একাই ভ্রমণ করছিলাম। ঠগ-বাটপারের খপ্পরেই পড়ি কি না ভেবে পেটে ক্ষুধা নিয়ে বাসেই বসে থাকি। কখন ঝিমুনি আসে, আসে তন্দ্রা। ফেরিঘাটের নৈমিত্তিক হইচইসহ নানারকম শব্দে ঘুমানোর উপায়ও নেই। মনে পড়ে, আমাদের বাস যখন ফেরিতে মাঝ নদীতে তখন দূরের মসজিদের মাইক থেকে ভেসে আসছিল ফজরের আজান। এভাবে সারাটি রাত কেটে গিয়েছিল ফেরি পার হতে। এর দেড় বছর পর ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় ৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু। একটি সেতুর কারণে বদলে গেছে গোটা উত্তরবঙ্গের জনজীবন। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছে লাখো লাখো মানুষ। শস্যাবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে কৃষি জমিতে। ফল, ফসল, সবজি থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গে উৎপাদিত সব ধরনের পণ্য ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। গতি সঞ্চার হয়েছে দেশের অর্থনীতিতে।

যান নিয়ে ফেরিতে কেবল পদ্মা নদী পাড়ি দিতে লাগে এখন ৩৫ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ আড়াই ঘণ্টা। কিন্তু ফেরিতে উঠার সিরিয়ালের অপেক্ষা দুই-তিন ঘণ্টা থেকে সাত-আট ঘণ্টা। ঈদসহ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কখনও তার চেয়েও বেশি সময় কেটে যায় ফেরিঘাটে। ফেরির অপেক্ষায় ঢাকার হাসপাতালে রেফার করা কত মুমূর্ষু রোগী প্রাণ ত্যাগ করেছে পদ্মার ওপার! আবার আবহাওয়ার মর্জি ভালো না থাকলে অনিশ্চয়তার শেষ নেই। কখনও দুই-তিন দিনও বন্ধ থাকে ফেরি সার্ভিস। এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে আর যাই হোক ব্যাবসাবাণিজ্যের বিকাশ ঘটতে পারে না। এছাড়াও নদী পারাপারে ফেরি দুর্ঘটনাসহ নৌডুবিতে কত প্রাণহানির ঘটনাই না ঘটেছে। এখানেই পদ্মা সেতুর গুরুত্ব নিহিত।

যমুনা সেতুর চেয়েও আরও বেশি সম্ভাবনা নিয়ে জাতির জন্য উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে পদ্মা সেতু। এপারে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া আর ওপারে শরীয়তপুরের জাজিরা। দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার ও প্রস্থ ১৮ দশমিক ১০ মিটার। ২৫শে জুন উদ্‌বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যমুনা সেতুর কাজ শুরু হওয়ার আগে পদ্মার ওপর সেতুর কথা কারও মাথায় আসেনি। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় বসেই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ১৯৯৯ সালেই হয় প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ফলে সরাসরি উপকৃত হবে তিন বিভাগের ২১ জেলার মানুষ। জেলাগুলো হলো– খুলনা বিভাগের খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর,

পদ্মা সেতুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা

চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা; বরিশাল বিভাগের বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠি এবং ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী। বহু পথ ঘুরে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে কোনো কোনো জেলার ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। পদ্মা সেতু খুলে দিলে চাপ কমবে পাটুরিয়া ঘাট ও যমুনা সেতুর ওপর। এই প্রথম শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুরসহ আরও কয়েকটি জেলার সঙ্গে ঢাকার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর দূরত্বও কমে যাবে বহুলাংশে। ঢাকা থেকে বরিশালের দূরত্বই কমবে প্রায় ১০০ কিলোমিটার। ঢাকার গাবতলী থেকে আরিচা হয়ে বরিশালের দূরত্ব ২৪২ কিলোমিটার। সায়েদাবাদ থেকে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে এই শহরটির দূরত্ব হবে ১৫৬ কিলোমিটার। আবার গাবতলী থেকে আরিচা হয়ে ঝিনাইদহ-যশোর হয়ে খুলনার দূরত্ব ২৯২ কিলোমিটার। পদ্মা সেতুর রুটে হবে ২৪৭ কিলোমিটার। বরিশাল থেকে তিন ঘণ্টায়, খুলনা থেকে চার ঘণ্টায়, ফরিদপুর থেকে দুই ঘণ্টায়, যশোর থেকে সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছানো যাবে।

কেবল মানুষের চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্যই নয়, মালামাল পরিবহণেও আসছে গতি। যশোরের বেনাপোল স্থল বন্দর, সাতক্ষীরার ভোমরা স্থল বন্দর, বাগেরহাটের মোংলা বন্দর, পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরের পণ্য ঢাকা ও অন্যান্য শহরে পৌঁছে যাবে সহজেই। মোংলা ও পায়রা বন্দরের কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভারী শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টির কথা বলছেন অর্থনীতিবিদরা। মোংলা বন্দর এলাকায় বেশ কয়েকটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে এবং গড়ে উঠছে গার্মেন্টসসহ রপ্তানিমুখী শিল্প। একদিকে বন্দর আর অন্যদিকে ঢাকার সাথে সরাসরি যোগাযোগে সময় কমে আসা পুরো অঞ্চলের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেও মনে করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ওপরও চাপ কমবে।

খুলনা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুরের মাছ, যশোরের সবজি আর ফুল, বরিশালের ধান ও পান, সাতক্ষীরার আম-লিচুসহ অন্যান্য ফলফলাদি ও মুরগি সহজেই পৌঁছাবে ঢাকায়। এসব এলাকার বহু পণ্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাইরে যেত না। ঢাকার বাজারে বৃহত্তর ফরিদপুরের মাছ পাঠানোর কথা চিন্তাও করা হতো না। অথচ গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও ফরিদপুরের বিল ও নিম্নাঞ্চলগুলো মুক্ত জলাশয়ের মাছের জন্য বিখ্যাত। সেতুর কারণে এসব জেলার সব ধরনের কৃষিপণ্য তাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বাজারে দ্রুত যেতে পারবে। শুধু ঢাকা নয়, চট্টগ্রাম-সিলেটসহ বড়ো বড়ো জেলা শহরগুলোতেও এসব পণ্য প্রবেশের সুযোগ পেতে যাচ্ছে। যশোরের ফুল রাজধানীসহ সারা দেশে বাজারজাত করা হয়। দেশে ফুলের বাজার দিন দিন বড়ো হচ্ছে। সেতু চালু হলে বিদেশে ফুল রপ্তানিরও দ্বারোন্মোচন ঘটবে। মোটকথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে কৃষি খাতে বড়ো ধরনের গতিশীলতা আসছে।

পর্যটকদের কাছে এক বড়ো আকর্ষণের নাম সুন্দরবন ও কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের প্রতি অদম্য আগ্রহ রয়েছে শিক্ষার্থী ও পর্যটকদের মাঝে। এতদিন আসা-যাওয়ার দীর্ঘ সময়ের ঝক্কি এবং অনিশ্চিত পদ্মা পাড়ি দেওয়ার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের অনেকেই সুন্দরবন ভ্রমণের উৎসাহ হারাতেন। পর্যটনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষের কাছে কুয়াকাটা-সুন্দরবন আর 'দিল্লি দূর অস্ত' থাকছে না। বাস্তবতা হলো, পর্যটন কেবল শহুরেদের মধ্যে আটকে নেই। এখন কিন্তু মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের লোকজনও দলবেঁধে গাড়ি ভাড়া করে অহরহই কক্সবাজার, সিলেট যাওয়া-আসা করছেন। তাদের তালিকায় নতুন করে যুক্ত হবে সুন্দরবন ও কুয়াকাটা। আবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লোকজন আগ্রহী হবেন পর্যটন বিস্ময় কক্সবাজার, পাহাড়-অরণ্যের লীলাভূমি সিলেট এবং ভাটির হাওর পরিদর্শনে। আর সারা দেশের মানুষ ছুটবে

একবারের জন্য হলেও নিজের চোখে দেশের দীর্ঘতম সেতুটি দেখতে। দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা পদ্মা সেতুকে আলোকিত করে রাখবে রাতেও। বিশেষ দিনগুলোতে সেতুর লাইটিং ছড়াবে আলোর ছটা। শুধু পদ্মাপারের মানুষ নয়, আলোকসজ্জা বা আর্কিটেকচারাল লাইটিং দেখার জন্য সারা দেশ থেকে ছুটে আসবে সৌন্দর্যপিপাসু মানুষ। সেতুর নানা বৈচিত্র্যের অন্যতম আকর্ষণ এই লাইটিং। ফলে সেতুকে কেন্দ্র করেও পর্যটন খাতে বিরাট প্রাণচাঞ্চল্যের সঞ্চার হবে।

প্রমত্তা পদ্মার ওপর সেতু নির্মাণে প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক। একে তো প্রবল স্রোত। তার ওপর ঢেউ। এদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে প্রকৌশলীদের। মাটির স্তর না পেয়ে পাইলিং করতে গিয়েও ছিল প্রতিবন্ধকতা। মূল নদীর মধ্যে ১৫০ মিটার পর পর বসানো হয়েছে ৪২টি পিলার। তবে সড়কের সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে দুই প্রান্তে আরও অনেক খুঁটিই রয়েছে। দুপাশে সড়কের সঙ্গে সংযোগ মিলিয়ে সেতুটি ৯ দশমিক ৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ। পদ্মা নদীর পানির স্তর থেকে ৫০ ফুট উঁচুতে বসানো হয়েছে প্রতিটি স্প্যান। একেকটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। স্প্যান বসেছে মোট ৪১টি। স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের বেশি হলে কনক্রিটের পরিবর্তে কাঠামোতে স্টিল ব্যবহার করা হয়। স্টিল কাঠামোর কারণে সেতুর ওজন কম হয়। ফলে ভূমিকম্পে তা ঘাত সহনীয় হয়। বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, ৮ মাত্রার ভূমিকম্পেও সেতুর কিছুই হবে না। নির্মাণকালে ভাসমান ক্রেনের সাহায্যে সেতুতে স্টিলের স্প্যান বসানো হয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালী হাতুড়ি ব্যবহারের কথা আমরা জেনেছি পত্রপত্রিকায়। সেতুর স্থায়িত্ব হবে ১০০ বছরেরও বেশি। ব্যবহৃত টেকনিকে নতুনত্ব আছে বলেই পদ্মা সেতু স্টাডি করবেন প্রকৌশল বিষয়ের দেশি-বিদেশি ছাত্র ও গবেষকগণ। এটি আমাদের জন্য গৌরবের। এটি দ্বিতল একটি সেতু। উপরে চার লেনের সড়কে চলবে বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, মোটর সাইকেল ইত্যাদি। আর নিচে থাকছে রেলপথ। যান চলাচল শুরু হওয়ার পর পর শুরু হবে সেতুতে রেললাইন স্থাপনের কাজ। সেতুতে টোলের হার এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে ১৫-১৬ বছরের মধ্যেই নির্মাণ ব্যয় উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, সেতু পুরোপুরি চালু হলে দেশের জিডিপিতে এটি এক দশমিক দুই শতাংশ অবদান রাখবে। বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পদ্মা সেতুর অবদান দুই শতাংশের কাছাকাছি চলে যাবে।

পদ্মা সেতু কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নয় বরং সারা দেশের সংযোগ সেতু। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করছে এ সেতু। অনেক পানি ঘোলা হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনড় মনোভাবের কারণেই ২০১৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর শুরু হয় দেশের বৃহত্তম অবকাঠামো প্রকল্পের নির্মাণকাজ। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও চোখ রাঙানিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আপোশহীন, অনড় ও অবিসংবাদিত নেতৃত্বে প্রমাণিত হয়েছে– 'আমরাও পারি'। সাহসী ও দৃঢ় মনোভাবের মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী রাষ্ট্রনেতা হিসেবে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতু আমাদের স্বনির্ভরতার প্রতীক। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের একটি বড়ো সম্পদ। এটি আমাদের অহংকার। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতীক।

ইয়াকুব আলী: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রেস অ্যান্ড মিনিস্টিরিয়াল পাবলিসিটি), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০২০

সরকার বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান রাখায় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কারের জন্য সাত জন ব্যক্তি ও ষোলোটি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেছে। ২২শে মে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৃক্ষরাপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০২০ পদক সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় মনোনীতদের বাছাই করা হয়। উপজেলা, জেলা এবং বিভাগ পর্যায়ে বিচারের পর জাতীয় কমিটি চূড়ান্তভাবে এই পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান করে। ২৩শে মে মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এবছর বিদ্যালয়/সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে ভোলার কুলসুম রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নড়াইল সদরের চালিতাতলা সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কেটিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় মনোনীত হয়েছে। কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের শাহ নেয়ামতুল্লাহ কলেজ ও ঝিনাইদহের এমডি ডিগ্রি কলেজ মনোনীত হয়েছে। স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পুস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ।

অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সেক্টর করপোরেশন ও প্রতিষ্ঠান শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে টাঙ্গাইলে ঘাটাইল শহীদ সালাউদ্দিন সেনানিবাস, খুলনার শুন শিং সিমেন্ট মিলস এবং কুমিল্লার পানি উন্নয়ন বোর্ড/এনজিও/ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শ্রেণিতে প্রথম পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। নওগাঁর 'মানব সেবা' ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য শেরপুরের মো. হজরত আলী আকন্দ, চুয়াডাঙ্গার আদিনা মালিক ও চট্টগ্রামের রাউজানের সংসদ সদস্য এপিএম ফজলে করিম চৌধুরী মনোনীত হয়েছেন।

প্রতিবেদন: আবিদ হোসেন

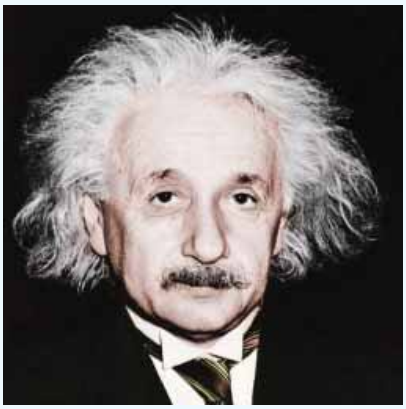

আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিং এবং মেরিলিন মনরো

মো. রফিকুজ্জামান

আলবার্ট আইনস্টাইন ১৪ই মার্চ ১৮৭৯ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণকারী একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি মূলত আপেক্ষিকতার তত্ত্ব (Theory of Relativity) এবং ভর-শক্তি সমতুল্যতার সূত্র (Mass-Energy Equivalence Formula) E=mc2 (যা 'বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত সমীকরণ') আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। তিনি ১৯২১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ অবদান এবং আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণার জন্য তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর পিতা একটি তড়িৎ রাসায়নিক কারখানা পরিচালনা করতেন। আইনস্টাইন ১৮৯৫ সালে সুইজারল্যান্ডে চলে আসেন এবং পরের বছর জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে বিশেষায়িত হওয়ায় ১৯০০ সালে জুরিখের ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুল থেকে একাডেমিক শিক্ষা ডিপ্লোমা অর্জন করেন। পরের বছর তিনি সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্ব অর্জন করেছিলেন, যা তিনি আর ত্যাগ করেননি। তিনি ১৯০২ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত বার্নের সুইজারল্যান্ডীয় পেটেন্ট অফিসে পেটেন্ট পরীক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে তাঁর অবদান অনেক। সবচেয়ে বিখ্যাত অবদান আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব (Special Relativity Theory) এবং আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব (General Theory of Relativity)। তাঁর অন্যান্য অবদানের মধ্যে রয়েছে আপেক্ষিকতাভিত্তিক বিশ্বতত্ত্ব, কৈশিক ক্রিয়া, পরিসংখ্যানিক বলবিজ্ঞান ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান– যা তাঁকে অণুর ব্রাউনীয় গতি (Random motion of particles suspended in a medium liquid or gas) ব্যাখ্যা করার দিকে পরিচালিত করেছিল। আণবিক ক্রান্তিকের সম্ভাব্যতা, আণবিক গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্ব, নিম্ন বিকরণ ঘনত্বে আলোর তাপীয় ধর্ম (বিকিরণের একটি তত্ত্ব যা ফোটন তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করেছিল), একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন এবং পদার্থবিজ্ঞানের জ্যামিতিকীকরণ করেছিলেন।

১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকাকালীন সময়ে এডলফ হিটলার জার্মানির ক্ষমতায় আসেন। ইহুদি হওয়ার কারণে আইনস্টাইন আর জার্মানিতে ফিরে যাননি। আমেরিকাতেই তিনি থিতু হন এবং ১৯৪০ সালে আমেরিকার নাগরিকত্ব পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি জার্মান পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং মেক্সিকোকে একই ধরনের গবেষণা শুরুর তাগিদ দেন। তাঁর এই চিঠির মাধ্যমেই ম্যানহাটন প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়। আইনস্টাইন মিত্রবাহিনীকে সমর্থন করলেও পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন। পরে ব্রিটিশ দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেলের সঙ্গে মিলে পারমাণবিক অস্ত্রের বিপদের কথা তুলে ধরে রাসেল-আইনস্টাইন ইশতাহার রচনা করেন। ১৯৫৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আইনস্টাইন ৩০০টিরও অধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র এবং ১৫০টির বেশি বিজ্ঞান-বহির্ভূত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। ১৯৯৯ সালে *টাইম* সাময়িকী আইনস্টাইনকে 'শতাব্দীর সেরা ব্যক্তি' হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়া বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীদের একটি ভোটের মাধ্যমে জানা গেছে, তাঁকে প্রায় সকলেই সর্বকালের সেরা পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে মেধাবী এবং প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রায়শই 'আইনস্টাইন' বলে সম্বোধন করা হয়। অর্থাৎ এটি প্রতিভা শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আইনস্টাইন ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

অন্যদিকে স্টিফেন হকিংয়ের জন্ম ১৯৪২ সালের ৮ই জানুয়ারি। বিজ্ঞান জগতের মানুষের কাছে এ তারিখটির আলাদা ব্যঞ্জনা আছে। কারণ, এর ঠিক ৩০০ বছর আগে এই দিনে গ্যালিলিও ধরাধামের মায়া ত্যাগ করেন। তবে হকিংকে একথা মনে করিয়ে দিলে তিনি বলতেন, 'ধুর', ওদিন শুধু লন্ডনেই ২০০ ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছে।

অক্সফোর্ডে হকিংয়ের বাবা ড. ফ্রাঙ্ক হকিং একজন জীববিজ্ঞান গবেষক ও মা ইসোবেল হকিং একজন রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর মা ছিলেন স্কটিশ। হকিংয়ের বাবা-মা উত্তর লন্ডনে থাকতেন। লন্ডনে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজছে, তখন একটি চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাঁর মা-বাবার পরিচয় হয়, সেখানে ইসোবেল

মেডিকেল সহকারী হিসেবে এবং ফ্রাঙ্ক চিকিৎসা গবেষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। হকিং তাঁর মায়ের গর্ভে আসার পর নিরাপত্তার খাতিরে তাঁরা অক্সফোর্ডে চলে যান। হকিংয়ের জন্মের পর তাঁরা আবার লন্ডনে ফিরে আসেন। ফিলিপ্পা ও মেরি নামে হকিংয়ের দুই বোন রয়েছে। এছাড়া হকিং পরিবারে অ্যাডওয়ার্ড নামে এক পালক পুত্রও ছিল।

লন্ডনের হাইগেটের বাইরন হাউজ স্কুলে হকিংয়ের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯৫০ সালে হকিংদের পরিবার হার্টফোর্ডশায়ারের সেন্ট অ্যালবান্সে চলে যায়। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত হকিং কয়েক মাস সেন্ট অ্যালবান্সের মেয়েদের স্কুলে পড়েন। সেসময় ১০ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেরা মেয়েদের স্কুলে পড়তে পারত। পরে সেখান থেকে ছেলেদের স্কুলে চলে যান। স্কুলে তাঁর রেজাল্ট ভালো ছিল বটে, তবে অসাধারণ ছিল না।

হকিংয়ের বাবা চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র প্রখ্যাত ওয়েস্টমিনিস্টার স্কুলে পড়াশুনা করুক, কিন্তু ১৩ বছর বয়সি হকিং বৃত্তি পরীক্ষার দিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৃত্তি ছাড়া তাঁর পরিবার ওয়েস্টমিনিস্টারে পড়াশুনার খরচ চালাতে পারবে না, তাই তিনি সেন্ট অ্যালবান্সে রয়ে যান। এর একটি ইতিবাচক দিক ছিল, হকিং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে রয়ে যান এবং বোর্ড গেম খেলতেন, আতশবাজি প্রস্তুত করতেন, উড়োজাহাজ ও নৌকার মডেল তৈরি করতেন এবং খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অনুভূতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতেন।

স্কুলে হকিং 'আইনস্টাইন' নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু শুরুর দিকে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল তেমন ভালো ছিল না। বিজ্ঞানে হকিংয়ের সহজাত আগ্রহ ছিল। হকিং তাঁর একজন শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। হকিংয়ের বাবার ইচ্ছে ছিল হকিং যেন তাঁর মতো ডাক্তার হয়, কারণ গণিতে স্নাতকদের জন্য খুব বেশি চাকরির সুযোগ ছিল না। এছাড়া তাঁর পিতা নিজের কলেজ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি করাতে চান। যেহেতু সেখানে গণিতের কোর্স পড়ানো হতো না, সেজন্য হকিং পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয় নিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। হকিং ১৯৫৯ সালের অক্টোবরের দিকে মাত্র ১৭ বছর বয়সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে তাঁর স্নাতক পাঠগ্রহণ শুরু করেন। প্রথম ১৮ মাস তিনি বিরক্ত ও একাকিত্ব বোধ করতেন, কারণ তাঁর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ 'হাস্যকর রকমের সহজ' মনে হতো। অবশ্য অক্সফোর্ড থেকেই তিনি সাফল্যের সাথে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ১৯৬২ সালে ক্যামব্রিজ নগরীতে ট্রিনিটি হলে অধ্যয়ন শুরু করেন এবং সেখান থেকে ১৯৬৬ সালে ফলিত গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন, যেখানে তাঁর গবেষণার বিশেষায়িত ক্ষেত্র ছিল সাধারণ আপেক্ষিকতা ও বিশ্বতত্ত্ব।

ক্যামব্রিজে আসার পরপরই ১৯৬৩ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে হকিংয়ের দেহে ধীরগতিতে অগ্রসরমান একপ্রকার চেষ্টীয় স্নায়ুকোষ রোগের সূত্রপাত হয়, যে রোগের নাম পেশীক্ষয়কারী পার্শ্বিক কাঠিন্য রোগ (Amyotrophic lateral sclerosis)। রোগটির কারণে হকিং পরবর্তী দশকগুলোতে ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তবুও বহু বছর যাবৎ তিনি তাঁর গবেষণা কার্যক্রম সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যান। এক পর্যায়ে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলার পরও তিনি একধরনের ভাষা উৎপাদনকারী যন্ত্রের সাহায্যে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতেন। প্রথমে হাতে রাখা একটি সুইচের মাধ্যমে এবং শেষ পর্যন্ত গালের একটিমাত্র পেশীর সাহায্যে তিনি যন্ত্রটি পরিচালনা করতেন।

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে হকিংয়ের প্রধান অবদান দুইটি। প্রথমত তিনি সতীর্থ রজার পেনরোজের সঙ্গে মিলে সাধারণ আপেক্ষিকতার প্রসঙ্গ কাঠামোর ভেতরে মহাকর্ষীয় অদ্বৈত অবস্থান সংক্রান্ত কিছু উপপাদ্য প্রদান করেন, যাদের নাম পেনরোজ-হকিং অদ্বৈত অবস্থান উপপাদ্যসমূহ (Penrose-Hawking singularity theorems)। দ্বিতীয়ত তিনি অনিশ্চয়তার তত্ত্ব কৃষ্ণগহ্বর (Black Holes)-এর ঘটনা দিগন্তে প্রয়োগ করে দেখান যে, কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণাপ্রবাহ বিকিরিত হয়। এই বিকিরণকে বর্তমানে হকিং বিকিরণ (অথবা কখনো কখনো বেকেনস্টাইন-হকিং বিকিরণ) নামে অভিহিত করা হয়। এছাড়া হকিং প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের একীভবনের মাধ্যমে একটি বিশ্বতত্ত্ব নির্মাণের প্রচেষ্টা চালান। তিনি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের বহু-বিশ্ব ব্যাখ্যার বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন।

তিনি রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের সম্মানিত সভ্য বা ফেলো এবং পন্টিফিক্যাল একাডেমি অব সায়েন্সের (Pontifical Academy of Sciences) আজীবন সদস্য ছিলেন। ২০০৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম' (রাষ্ট্রপতির মুক্তি পদক) খেতাবে ভূষিত হন। ২০০২ সালে ব্রিটিশ গণমাধ্যম সংস্থা *বিবিসি* পরিচালিত যুক্তরাজ্যের ইতিহাসের 'সেরা ১০০ যুক্তরাজ্যবাসী' নামক জরিপে তিনি ২৫তম স্থান অধিকার করেন।

১৯৭৪ সালে হকিং রয়্যাল সোসাইটির অন্যতম কনিষ্ঠ ফেলো নির্বাচিত হন। ক্যামব্রিজে হকিং যখন স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থী, তখন জেন ওয়াইল্ডের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জেন ছিলেন তাঁর বোনের বান্ধবী। ১৯৬৩ সালে হকিংয়ের রোগের চিকিৎসার পূর্বে জেনের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়। হকিং পরবর্তীতে বলেন এই বাগদান তাঁকে 'বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা' জোগায়। ১৯৬৫ সালের ১৪ই জুলাই তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের পুত্র রবার্ট ১৯৬৭ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের কন্যা লুসি ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণ করে এবং তৃতীয় সন্তান টিমোথি ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করে।

হকিং ২০১৮ সালের ১৪ই মার্চ ক্যামব্রিজে তাঁর বাড়িতে মারা যান। হকিং ক্যামব্রিজ নগরীর গনভিল অ্যান্ড কাইয়ুস কলেজের সভ্য (ফেলো) হিসেবে কাজ করেন। তাঁর মৃত্যুতে গনভিল অ্যান্ড কাইয়ুস কলেজের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং সেখানকার শিক্ষার্থী ও অতিথিরা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন। তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালের ৩১শে মার্চ ক্যামব্রিজের গ্রেট সেন্ট ম্যারিস গির্জায়। মরদেহ পুড়িয়ে ফেলার পর তার ভস্ম ২০১৮ সালের ১৫ই জুন ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে আইজাক নিউটনের সমাধির পাশে ও চার্লস ডারউইনের সমাধি সংলগ্ন অংশে পুঁতে ফেলা হয়।

বিজ্ঞান চর্চা এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান গবেষণা নিয়ে এতক্ষণ আইনস্টাইন ও স্টিফেন হকিংয়ের জীবনকাহিনি, পড়াশুনা নিয়ে কিছু বলা হলো। এখন দুজনকে নিয়ে তাঁদের স্বপ্নের রানির প্রসঙ্গে আসা যাক। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে তাঁরা দুজনাই একজনকে

নিয়ে ভেবেছেন। এ ভাবনায় হয়ত প্রেম ছিল না, তবে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল অসীম। আইনস্টাইন ও হকিং দুজনই ভেবেছেন পৃথিবী বিখ্যাত সুন্দরী নায়িকা মেরিলিন মনরোকে নিয়ে।

জানা যায় হকিংয়ের রুমে দুজন লোকের পোস্টার আছে। তাঁর টেবিলের পেছনে আইনস্টাইনের ছবি। আর রুমের দরজায় লাগানো মেরিলিন মনরো! হ্যাঁ, মেরিলিন মনরোই ছিলেন স্টিফেন উইলিয়াম হকিংয়ের প্রিয় নায়িকা ও অনুপ্রেরণার উৎস। হকিংয়ের জীবিত অবস্থায় আপনি যদি তাঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকার সুযোগ পেতেন, তাহলে হয়ত দেখতে পেতেন তাঁর সহকারী বা নার্স এসে তাঁকে পানি বা কফি পান করিয়ে যেত। তখন আপনি অবাক হয়ে দেখতেন, যে মগে করে হকিং কফি বা পানি খাচ্ছেন, সেটির গায়েও বসে আছেন লাস্যময়ী মেরিলিন মনরো।

এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে হকিংয়ের কাছে জানতে চাওয়া হয়, যদি কোনো মরুভূমিতে আপনাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, তাহলে কোন তিনজনকে আপনি সঙ্গে নেবেন? হকিংয়ের সহজ উত্তর– মেরিলিন মনরো, গ্যালিলিও গ্যালিলি ও আলবার্ট আইনস্টাইন। গ্যালিলিও আর আইনস্টাইনের সঙ্গে মেরিলিন মনরোই হকিংয়ের সঙ্গী হবেন মরুভূমিতে।

মেরিলিন মনরোর বিখ্যাত ছবিতে স্টিফেন হকিংয়ের ছবি যুক্ত করেন জোশুয়া গ্রিন। হকিংয়ের জন্মের সময় মডেল হিসেবে মোটামুটি জানাশোনা হয়ে গেছে নোরমা জিনের। নোরমা জিন তখন সুইট সিক্সটিন। তার কিছুদিন পরই নোরমা জিন হয়ে যান মেরিলিন মনরো এবং প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে হয়ে যান লাখো কোটি তরুণের হৃদয়েশ্বরী। এই সময় শোনা যায়, এমন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নেই, যার সঙ্গে মনরোর যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই। এমনকি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও এই লিস্টে আছেন।

অভিনেত্রী শেলি উইন্টারের সঙ্গে একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন মেরিলিন মনরো ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত। সেখানে একদিন শেলি ও মনরো মিলে একটা তালিকা করেন। সব বিখ্যাত মানুষের নাম। শেলির বক্তব্য হলো মনরোর উচিত হবে এদের সবার সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলা! তালিকায় মনরো একটা নতুন নাম যোগ করেন, সবার নিচে আলবার্ট আইনস্টাইন! বিজ্ঞানীর নাম দেখে হতবাক শেলি বললেন, উনি একজন সায়েন্টিস্ট এবং বুড়ো। জবাবে শুধু একটি মুচকি হাসি দেন মেরিলিন মনরো।

১৯৮২ সালে কাল্পনিক একটি নাটকে দেখা যায়, আইনস্টাইনের সঙ্গে মনরোর দেখা হয়েছে একটি হোটেল কক্ষে। ১৯৮৫ সালে ওই নাটকটি সিনেমা হয়। *ইনসিগনিফিকেন্ট* নামে ওই সিনেমায় দেখা যায়, আইনস্টাইন হোটেল কক্ষে বসে অঙ্ক করছেন, আর মেরিলিন মনরো দরজায় নক করেন। মনরো আইনস্টাইনকে জানান, তাঁর কিছু আলাপ আছে এবং সে বিজ্ঞানীকে থিওরি অব রিলেটিভিটি নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা দিতে বলেন। আইনস্টাইন তখন তাঁকে কক্ষের ভেতরে নিয়ে যান। সিনেমায় এভাবেই দেখা যায় মনরো আর আইনস্টাইনকে। মনরো ঘরের মেঝেতে বসে পদার্থের গতি ও আপেক্ষিকতা নিয়ে প্রশ্ন করছেন এবং আইনস্টাইন একটি চেয়ারে বসে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। পরিবেশটি ছিল অত্যন্ত মধুর ও রোমান্টিক।

আইনস্টাইনের কাছে একবার আপেক্ষিকতার সহজ ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, যে-কোনো সেমিনারে ১০ মিনিটকে মনে হয় এক ঘণ্টা, কিন্তু যদি কোনো সুন্দরী অভিনেত্রীর সঙ্গে আপনি গল্প করতে পারেন, তাহলে দেখবেন মাত্র দুই মিনিটে এক ঘণ্টা চলে গেছে! এটাই আপেক্ষিকতা। গুজব আছে, সুন্দরী অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো আইনস্টাইনের প্রতি দুর্বল ছিলেন। তাই একদিন মনরো আইনস্টাইনকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এইভাবে, 'চলুন না, আমরা বিয়ে করে ফেলি? তাহলে আমাদের সন্তানেরা হবে সৌন্দর্য ও জ্ঞানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান। ওরা দেখতে হবে আমার মতো আর বুদ্ধিতে আপনার মতো।' আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আর যদি উলটোটা হয়? দেখতে যদি হয় আমার মতো আর বুদ্ধিতে আপনার মতো?'

হকিংয়ে ফেরা যাক। অক্সফোর্ড থেকে ক্যামব্রিজে ফেরার পরপরই সবার জানা হয়ে যায়, হকিং হচ্ছেন মেরিলিনের পাগলা ভক্ত। এসময় মেরিলিনের একবার ইংল্যান্ডে আসার কথা। সেই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য হকিং সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন, কিন্তু সেই সফর আর হয়নি। এ নিয়ে হকিংয়ের আফসোসের সীমা ছিল না। হকিংয়ের ডেস্কে তিনটি ছবির ফ্রেম থাকত। একটিতে তাঁর তিন সন্তানের সঙ্গে প্রথম স্ত্রী জেন ওয়াইল্ডের। পরেরটি হকিংয়ের দ্বিতীয় বিয়ের ছবি, স্ত্রী এলিনা হকিংয়ের। তৃতীয় ছবিটি হুইলচেয়ারে বসে আছেন স্টিফেন হকিং আর তাঁর পেছনে একটি ক্যাডিলাক গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হকিংয়ের প্রিয় নায়িকা। হকিংয়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তিনি তাঁর বিখ্যাত হাসি হাসছেন।

মনরোর বিখ্যাত যে স্থিরচিত্রগুলো আমরা দেখি, সেগুলোর বেশির ভাগই ফটোগ্রাফার মিল্টন এইচ গ্রিন তুলেছেন। এই আমেরিকান ফ্যাশন ফটোগ্রাফার মেরিলিন মনরোর অনেক ছবি তুলে নিজেও বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর ছেলে জোশুয়া গ্রিন যখন জানতে পারেন, হকিং মেরিলিন মনরোর ডাই হার্ড ফ্যান, তখন তিনি হকিংকে চমকে দেওয়ার আয়োজন করেন। বাবার তোলা ক্যাডিলাক গাড়ির সামনে মেরিলিন মনরোর বিখ্যাত ছবিটিতে হকিংকে ডিজিটালি যোগ করে দেন। ছবিটি হকিংকে উপহার দেন। এই ছবি জীবিত অবস্থায় হকিংয়ের ডেস্কে দেখা যেত!

থিউরিটিক্যাল ফিজিক্সের মতো সায়েন্সের কঠিন জিনিস নিয়ে যারা কাজ করতেন তারা স্বাভাবিকভাবেই গান-বাজনা বা বিনোদন পছন্দ করতেন। মেরিলিন মনরোর সাথে হকিংয়ের সম্পর্ক শুরু হয় তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন শুরুর পর্যায়ে। হকিং মেরিলিন মনরোর শো দেখে তাঁর বিনোদনের খোরাক জোগাতেন। হকিংয়ের জীবনে বিনোদনের প্রধান উৎস ছিল মেরিলিন মনরো। ১৯৬২ সালে মেরিলিন মনরোর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। মনরোর মৃত্যুর পর স্টিফেন হকিং কোনো না কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েন। অবশেষে কেবল তাঁর জেন ওয়াইল্ডকে পছন্দ হয়। ১৯৬৫ সালে তাঁদের বিয়ে হয়।

আইনস্টাইন ও হকিংকে নিয়ে অনেক রসালো গল্প রয়েছে যা পাঠকদের মনের ক্ষুধা মেটায়। পাঠকরা জেনে আন্দোলিত হয়, সন্তুষ্ট হয়। অনেক গল্প-কাহিনি রয়েছে যা বলে শেষ করা যাবে না। অতিসংক্ষিপ্ত আকারে এই লেখার মধ্যে তা তুলে ধরা হলো। পাঠকরা এটি পড়ে উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

মো. রফিকুজ্জামান: অতিরিক্ত সচিব (অব.) ও রেজিস্ট্রার, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলোজি

মানব কল্যাণে যোগ

শচীন্দ্র নাথ হালদার

যোগ মানবজাতির জন্য অন্যতম সেরা একটি উপহার। এ যোগে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার। চার হাজার বছরের বেশি আগে ঋষি পতঞ্জলি এ যোগ আবিষ্কার করেন। তাঁর এ আবিষ্কার পতঞ্জলির যোগসূত্র নামে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ মহান আবিষ্কার আধিকারিকদের কৃপণতার জন্য ধ্বংস হয়েছে। আধিকারিক মুনি-ঋষিরা উপযুক্ত শিষ্য বা পুত্র ছাড়া অন্য কাউকে এ গুহ্যবিদ্যা অনুশীলন করার সুযোগ দিতেন না। ফলে এ বিদ্যা ধারাবাহিকভাবে মানবজাতির অসামান্য কল্যাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

যোগ আত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ ঘটায়। যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম দেহ এবং দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারি। যোগীরা প্রধানত প্রাণের সাধনা করে থাকেন। যোগীদের জন্য প্রাণ ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্তা) এবং রোগীদের জন্য প্রাণ মহৌষধি। টেনশন, নৈরাশ্য, অধিক ওজন, খাদ্যাভাস, বংশগত, জীবাণু প্রভৃতিই আমাদের অধিকাংশ রোগের কারণ। প্রাণ মহৌষধি প্রয়োগের মাধ্যমে এসব রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে যে রস নির্গত হয় তার সমতা বিধান হয়। ফলে দেহে আর কোনো রোগ সৃষ্টি হতে পারে না। সমতাই স্বাস্থ্য এবং অসমতাই রোগ। আমাদের দেহের প্যানক্রিয়াস থেকে যে ইনসুলিন নির্গত হয় তা প্রয়োজন মতো নির্গত হলেই আমরা সুস্থ থাকি। যদি প্যানক্রিয়াস থেকে কম ইনসুলিন নির্গত হয় তাহলে আমরা ডায়াবেটিক (বহুমূত্র) রোগে আক্রান্ত হই। আবার যদি প্যানক্রিয়াস থেকে বেশি ইনসুলিন নির্গত হয় তাহলে আমাদের দেহে সব সময় ক্ষুধার ভাব দেখা দেয়। আমরা সাধারণভাবে শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবার ৫০০-১০০০ মিলিলিটার অক্সিজেন গ্রহণ করি কিন্তু যোগীরা প্রতিটি দীর্ঘ গভীর শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে ৫০০০-১০০০০ মিলিলিটার অক্সিজেন গ্রহণ করেন। ফলে যোগীর দেহের সমস্ত কোষগুলো অক্সিজেনে পূর্ণ থাকে। জীবকোষে অক্সিজেন সরবরাহের অভাবই আমাদের দেহের অধিকাংশ রোগের কারণ। গবেষণায় দেখা গেছে যে, অক্সিজেনের মধ্যে কোনো বীজাণু বা জীবাণু রাখলে তা মারা যায়। এমনকি ক্যানসারের জীবাণুও অক্সিজেনের মধ্যে বাঁচতে পারে না। যোগী দীর্ঘদিন যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে মনঃশক্তি চালনার শক্তি অর্জন করেন। দেহে শক্তির ভারসাম্যহীনতাই রোগের কারণ। দেহে কোনো স্থানে শক্তির অভাব দেখা দিলে যোগী মনঃশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সে স্থানের শক্তির অভাবটুকু পূরণ করতে পারেন। ফলে শীঘ্রই তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। বায়ু দূষিত হলে আমাদের দেহে নানা প্রকার রোগ হয়। এ বায়ু শুদ্ধি করার মাধ্যমে যোগী নিজেকে সুস্থ করতে পারেন। আমাদের নাভির নিচে এ বায়ুর অবস্থান। আমাদের দেহের খাদ্য পরিপাকতন্ত্রের সাথে এ বায়ুর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আমাদের জীবনের জন্য সঠিক আহার এবং সঠিক বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের মতো মৃত্যু মানবজীবনের একটি কঠিন সত্য। যোগীর জীবনাবসান সুখকর হয়। যোগী সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় পৃথিবী থেকে অমৃতলোকে গমন করতে পারেন। এটাই যোগের অন্যতম সেরা উপহার।

মনকে নিয়ন্ত্রণ করাকে যোগী অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে বিবেচনা করেন। যোগী মনকে অন্তর্মুখী করে দেহের ভেতর কী ঘটছে তা তিনি জানতে চান। যোগী বিশ্বাস করেন যে মনের শক্তি অসীম। যোগীরা কর্মবীর। তারা বিশ্বাস করেন কর্মই ধর্ম, কর্মই জীবন। মানবকল্যাণই তাদের কর্মের মূল উদ্দেশ্য। যোগী তীব্র ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হন। তার এ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তিনি অশেষ মানবকল্যাণ সাধন করেন। যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে যোগীর দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা দিব্যতায় ভরে উঠে। তিনি দিব্যজীবন লাভ করেন। যোগ অনুশীলনে পাপের ক্ষয় হয়। ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে যোগীর আত্মা শুদ্ধ, নির্লোভ ও নির্মল হয় এবং সাধনের জন্য উপযুক্ত হয়। পরিণামে সাক্ষাৎ নির্বাণ (মুক্তি) লাভ হয়।

যোগ বলতে আমরা সাধারণত রাজযোগ বুঝে থাকি। রাজযোগ ধর্মবিজ্ঞান। ধর্মের যাবতীয় প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর প্রদানে রাজযোগ সক্ষম। রাজযোগকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। যম বলতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহকে বুঝায়। এ যম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। কোনোভাবেই কোনো প্রাণীর অনিষ্ট না করাকে অহিংসা বলে। অহিংসা অপেক্ষা মহত্তম ধর্ম আর নেই। সত্য দ্বারাই আমরা কর্মের ফল লাভ করি। এ সত্যের ভেতর থেকেই সবকিছু পাওয়া যায়। সবকিছু সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ কথনকেই সত্য বলে। চুরি বা বলপূর্বক অপরের বস্তু গ্রহণ না করাকে অস্তেয় বলে। কায়মনোবাক্যে সর্বদা সকল অবস্থায় পবিত্রতা রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য। নিয়ম শব্দের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রত পালন। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল প্রকার শৌচই সাধনের জন্য প্রয়োজন। যম ও নিয়ম চরিত্র গঠনের সহায়ক।

আসন বলতে বুক, গ্রীবা ও মাথা সমান রেখে দীর্ঘক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্যভাবে বসে থাকার অবস্থাকে বুঝায়। যথা: পদ্মাসন, সিদ্ধাসন বা গোমুখাসন।

প্রাণায়াম শক্তি অর্জনের উপায়। অনেকেই মনে করে প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম। আসলে কিন্তু তা নয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টাই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের ক্রিয়া তিন প্রকার। যথা: রেচক, পুরক ও কুম্ভক। দেহ থেকে শ্বাস বাহিরে ছাড়াকে রেচক বলে। শ্বাস বাহির থেকে দেহের ভেতরে প্রবেশ করানোকে পুরক বলে এবং শ্বাস দেহের মধ্যে বা দেহের বাইরে ধরে রাখাকে কুম্ভক বলে। গৃহীদের খুব বেশি কুম্ভক করা উচিত নয়। প্রাণায়াম ফুসফুসের ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। প্রাণায়ামে মনঃশক্তিরূপ প্রাণের বিকারসমূহকে মানসিক উপায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। দীর্ঘদিন প্রাণায়ামের অনুশীলনের ফলে সাধক অষ্টসিদ্ধি লাভ করতে পারেন। তখন সাধকের নিকট অনন্ত শক্তির দরজা খুলে যায়। অষ্টসিদ্ধি হলো অণিমা, লঘিমা, গরিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব ও ঈশিত্ব। অষ্টসিদ্ধি লাভ হলে জগতের সকল শক্তি

ক্রীতদাসের মতো যোগীর আদেশ পালন করেন। প্রাণকে যিনি জয় করেছেন, সমস্ত জগৎ তিনি জয় করেছেন। তার আদেশে মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার হতে পারে। আমাদের দেহে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এ পাঁচ ধরনের বায়ু কাজ করে। নাভিমূলে সমান বায়ুর অবস্থান, নাভির উপরে প্রাণ বায়ু এবং নাভির নিচে অপান বায়ুর অবস্থান। প্রাণ বায়ুর সাথে অপান বায়ুর মিলন ঘটায়ে যোগী তখন ইচ্ছামৃত্যু লাভ করতে পারেন। আত্মদর্শন হলে দুঃখ, কষ্ট বা ভয় থাকে না। অরিষ্ট নামক মৃত্যু লক্ষণগুলোর উপর মনঃসংযোগ করলে যোগী তার মৃত্যুর সময় জানতে পারেন।

মন সর্বদাই কাম, রাগ, লোভ, মোহ, মদ ও পরশ্রীকাতরতা এ ছয় রিপুর তাড়নায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথা: চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক এ সংলগ্ন থাকে। মনের এ বিষয়াভিমুখী গতি ফিরিয়ে অন্তর্মুখী করাকে প্রত্যাহার বলে। চিন্তার একমুখতাই ধ্যান। ধ্যানাবস্থা মানব জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা। ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ে, মানুষের সুখ বুদ্ধিতে এবং দেবমানব ধ্যানেই সুখ লাভ করে থাকেন। মনের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে স্থায়ীভাবে ধারণ করাকে ধারণা বলে। হৃদপদ্মে, মাথার কেন্দ্রে বা দেহের অন্য কোনো স্থানে মনকে স্থির করার নামই ধারণা। দীর্ঘস্থায়ী গভীর ধ্যানকে সমাধি বলে। সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থায় সাধক জ্ঞানভূমি স্পর্শ করেন। আমাদের অধিকাংশ জ্ঞানই যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে অর্জিত জ্ঞান। এতে সত্য এবং অসত্যের মিশ্রণ থাকে। কিন্তু সমাধির জ্ঞান নির্ভেজাল জ্ঞান। সমাধিতে গিয়ে সাধক মহাজ্ঞানী হয়ে উঠেন। এ সমাধিতেই সাধক অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দেখে থাকেন। তিনি তখন অতীতের বার বার জন্ম-মৃত্যুর বিষয়াদি অবলোকন করে মুক্তিকামী হয়ে ওঠেন। সমগ্র মন যখন একটিমাত্র তরঙ্গে পরিণত হয়, মনের এ একরূপতার নামই সমাধি।

যোগ সাধনার সময় নানা প্রকার কাজ শরীরের মধ্যে চলতে থাকে। এর অধিকাংশই মেরুদণ্ডের ভেতর সুষুম্না নাড়িতে হয়ে থাকে। ইড়া (চন্দ্রনাড়ি) মেরুদণ্ডের বামে এবং পিঙ্গলা (সূর্যনাড়ি) মেরুদণ্ডের ডানে অবস্থিত এবং সুষুম্না নাড়ি মেরুদণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত। ইড়া এবং পিঙ্গলা আজ্ঞাবাহী নাড়ি এবং সমস্ত মেরুদণ্ড প্রাণীতেই এর কার্যকারিতা রয়েছে এবং মস্তিষ্কের আদেশে দেহ এর মাধ্যমেই কাজ করে। মেরুদণ্ডের মাঝখানে সুষুম্না নাড়ির অবস্থান এবং সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহেই এর অস্তিত্ব রয়েছে। সাধারণ মানুষের এ সুষুম্না নাড়ির কোনো কার্যকারিতা নেই এবং এর নিম্নাংশ বন্ধ থাকে। মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের সামান্য নিচে কুলকুণ্ডলিনী বা মূলাধারের অবস্থান এবং দেহের শক্তির কেন্দ্র এ মূলাধার। যোগীরা যোগ সাধনার দ্বারা সুষুম্নার নিম্নাংশ খুলে ফেলেন এবং শক্তি ঊর্ধ্বমুখে চালিত করেন। মূলাধার থেকে মাথা পর্যন্ত মেরুদণ্ড সংলগ্ন আটটি চক্র রয়েছে। সর্বনিম্নে মূলাধার চক্র, তারপর স্বাধিষ্ঠান চক্র, মনিপুরচক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র, আজ্ঞাচক্র, ললনা চক্র এবং মাথায় সহস্রদল চক্র। শক্তির দুটি রূপ। একটি পাশবিক রূপ এবং অপরটি আধ্যাত্মিক রূপ। নিম্নভূমি মূলাধার চক্র থেকে সহস্র্যদলচক্রে পৌঁছলে পাশবিক শক্তি ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়। এ ওজঃশক্তিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচায়ক। মানুষের জ্যোতির্ময় দেহের কারণও এ ওজঃশক্তি। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করাই দিব্যজ্ঞান, জ্ঞানাতীত অনুভূতি বা আত্মানুভূতি লাভের একমাত্র উপায়। কেউ সৃষ্টিকর্তার প্রেমে, কেউ সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপায় আবার কেউ সূক্ষ্ম জ্ঞান বিচার দ্বারা কুণ্ডলিনী জাগরিত করেন।

সাতটি স্তরে যোগী উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। যখন জ্ঞান লাভ হতে থাকে তখন একটির পর আর একটি করে সাতটি স্তরে আসতে থাকে। প্রথম অবস্থায় যোগী বুঝতে পারেন যে তিনি জ্ঞান লাভ করছেন। তখন সমস্ত অসন্তোষের ভাব চলে যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় সকল দুঃখ চলে যাবে। তৃতীয় অবস্থায় যোগী পূর্ণজ্ঞান লাভ করবেন। চতুর্থ অবস্থান বিবেক সহায়ে সকল কর্তব্যের অবসান হবে। পঞ্চম অবস্থায় চিত্তবিমুক্তি অবস্থা আসবে এবং যোগী বুঝতে পারবেন যে তার বাধাবিপত্তি সব চলে গিয়েছে। ষষ্ঠ অবস্থায় চিত্ত বুঝতে পারবে যে ইচ্ছামাত্রই উহা স্ব কারণে লীন হয়ে যাচ্ছে। সপ্তম অবস্থায় যোগী বুঝতে পারেন যে, তিনি স্ব স্ব রূপে আছেন। মন বা শরীরের সাথে আত্মার কোনো সম্পর্ক নেই। এরা আত্মার সাথে কখনও যুক্ত ছিল না। আত্মা একাকী, নিঃসঙ্গ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী ও সদানন্দ। আত্মা এত পবিত্র ও পূর্ণ যে তার আর কিছুরই আবশ্যক ছিল না। কারণ আত্মা পূর্ণস্বরূপ। ইহাই যোগীর চরম অবস্থা। যোগী তখন ধীর ও শান্ত হয়ে যান। আর কোনো প্রকার কষ্ট অনুভব করেন না এবং দুঃখ আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি জানতে পারেন যে তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ ও নিত্যপূর্ণস্বরূপ।

২১শে জুন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'। পৃথিবীর সকল দেশেই এ দিবস পালিত হয়। যোগের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করাই এ যোগ দিবস পালনের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সকল মানুষ যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে দিব্য, যোগময় জীবনযাপন করে সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম দেহ ও দীর্ঘজীবন লাভ করুক, 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে'– এটাই প্রত্যাশা।

শচীন্দ্র নাথ হালদার: প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

চারকোল নীতিমালা প্রণয়ন

পাটখড়ি থেকে চারকোল উৎপাদন পাটের বহুমুখী ব্যবহারের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পাটকাঠিকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় পোড়ানো, শীতলীকরণ ও সংকোচন করে চারকোল প্রস্তুত করা হয়। চারকোলে ৭৫ শতাংশ কার্বন থাকে। পানি বিশুদ্ধকরণ, আতশবাজি, জীবনরক্ষাকারী বিষনিরোধক ট্যাবলেট, প্রসাধন সামগ্রী, ফটোকপিয়ার ও কম্পিউটারের কালি তৈরির কাঁচামাল হিসেবে চারকোল ব্যবহৃত হয়। এ শিল্পের আরও বিকাশে 'চারকোল নীতিমালা ২০২২' প্রণয়ন করল বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রপ্তানিমুখী চারকোল শিল্পপ্রতিষ্ঠায় এ নীতিমালা কার্যকর হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ১লা জুন এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সরকারের পক্ষে পাট অধিদফতর এই নীতিমালা বাস্তবায়ন, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এছাড়া সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নীতিমালা সংশোধনসহ নতুন নতুন নির্দেশনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। পাট মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বর্তমানে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাগুরাসহ দেশের বেশ কিছু জেলায় প্রায় ৪০টি চারকোল কারখানা রয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ৭ হাজার ৭১ দশমিক ৪২ মেট্রিক টন (প্রায়) চারকোল রপ্তানি করে দেশে প্রায় ৪০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। সম্ভাবনাময় এই চারকোল শিল্প স্থাপন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে এতদিন কোনো নীতিমালা ছিল না। পরিবেশবান্ধব পাটখড়ি থেকে অত্যন্ত কম মাত্রার কার্বন নিঃসরণ হওয়ায় চারকোল শিল্প পরিবেশবান্ধব।

প্রতিবেদন: রেজওয়ানা হক

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৮ই মার্চ ২০২২ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন জয়িতাকে সম্মাননা প্রদান করেন –পিআইডি

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনা সরকারের অনন্য অবদান

মোতাহার হোসেন

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে বাংলাদেশ নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে সমান তালে, সমান গতিতে। দেশের তৃণমূল থেকে শুরু করে জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের নানামুখী পরিকল্পনা, পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ চলছে। বাস্তবে নারী তার মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সকল অগ্রগতি এবং উন্নয়নে রয়েছে সমঅংশীদারিত্ব। আর তাই বদলে গেছে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। এখন নারীর কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বীকৃতি। তৃণমূলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে জনপ্রতিনিধিসহ প্রশাসন, পুলিশ, বিচার, সামরিক, বেসামরিক, প্রশাসনের সর্বস্তরে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করেন। তিনি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেট প্রণয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। হ্রাস পাচ্ছে নারীর দারিদ্র্য, নারীর প্রতি বৈষম্যও।

প্রসঙ্গত দেশের নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। বিনির্মাণ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। বাস্তবায়িত হবে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০। নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বের রোল মডেল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ঘরে-বাইরে, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সর্বত্রই নারীর অংশগ্রহণ অনেকাংশে নিশ্চিত হয়েছে। এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চলেও। কর্মক্ষেত্রে নারীরা দক্ষতা প্রমাণ করছেন, কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন, নেতৃত্বও দিচ্ছেন। নারীরা এখন রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন, পর্বত জয় করছেন, অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও। নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে তো বটেই, উন্নত অনেক দেশ থেকেও এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। নারী-পুরুষের সমতা (জেন্ডার ইক্যুইটি) প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবার শীর্ষে বাংলাদেশ।

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করছে। জাতিসংঘের এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অব চেঞ্জ, শিক্ষায় লিঙ্গসমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেসকোর 'শান্তি বৃক্ষ' এবং গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে বাংলাদেশ। হার্ভার্ড ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে করা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডাব্লিউইএফ) জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টে রাষ্ট্র ক্ষমতায় নারীর অবস্থান বিবেচনায় সবাইকে পেছনে ফেলে বিশ্বের এক নম্বরে উঠে আসে বাংলাদেশের নাম। ডাব্লিউইএফের হিসাবে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নে ৪৮তম অবস্থানে বাংলাদেশ। এ অবস্থানের কারণই হচ্ছে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান পাঁচ। প্রথম চারটি দেশ হলো– আইসল্যান্ড, নিকারাগুয়া, নরওয়ে ও রুয়ান্ডা। নারী উন্নয়নে সার্বিক সূচকে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলভুক্ত ২৪টি দেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার পরেই দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থান বাংলাদেশের। বিশ্বের ৩৬টি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৭ অনুসারে, ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থান ছিল ৪৭তম, যা দক্ষিণ এশিয়ার যে-কোনো দেশের চেয়ে ভালো অবস্থান নির্দেশ করে।

নারীর ক্ষমতায়নে বেশ কিছু আইন, নীতি ও বিধিমালা তৈরি করেছে সরকার। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, মন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, বিচারপতি, সিনিয়র সচিব, সচিব, ডেপুটি গভর্নর, রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে মানবাধিকার ও নির্বাচন কমিশনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন নারী।

বর্তমানে প্রশাসনের উচ্চপদে অনেক নারী দায়িত্ব পালন করছেন। সচিব পর্যন্ত পদগুলোতে এ নারী কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে প্রশাসনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব রয়েছেন দশ জন নারী। মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ

জেলা প্রশাসক (ডিসি) আট জেলায় নারী ডিসিরা দায়িত্ব পালন করছেন। গত দুই দশকে বাংলাদেশে নারীর কর্মসংস্থান প্রায় ৩ ভাগেরও বেশি উন্নীত হয়ে ৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। মুজিববর্ষে ৫০ লাখ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত নারীকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের নারী বিজ্ঞানী ড. ফিরদৌসি কাদরি ২২তম 'ল-রিয়েল-ইউনেসকো ফর ওমেন ইন সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন। তিনি আইসিডিডিআরবির মিউকোসাল ইমুনোলজি অ্যান্ড ভ্যাকসিনোলজি ইউনিট অব ইনফেকসিয়াস ডিজিসেস ডিভিশনের প্রধান। ফিরদৌসি উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের সংক্রামক রোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য এই সম্মাননা পেয়েছেন। এছাড়া বিজ্ঞান গবেষণাসহ বাংলাদেশের মেয়েরা খেলাধুলায় বিগত কয়েক বছরে নিজেদের সাফল্য ধরে রেখেছে। আন্তর্জাতিকভাবে ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলায় তারা ভালো করছে।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অনেক অর্জন রয়েছে। বিশেষ করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নেও সরকার ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০২০ সাল নাগাদ সব রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা পরিষদে এক জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৩৩ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। নারীরা শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার কারণে সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে পদচারণা দ্রুত হারে বাড়ছে। সমান অধিকার, মর্যাদার প্রশ্নে নারীরা তৎপর, সার্বিক বিচারে সমাজের প্রতিটি পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। সরকার নারী উদ্যোক্তাদের বিনা জামানতে ও স্বল্প সুদে ঋণ দিচ্ছে। বছরে বিপুলসংখ্যক নারী চাকরি নিয়ে বিদেশে যাচ্ছেন। নারীর ক্ষমতায়নে গত ৫০ বছরের অর্জন বাংলাদেশকে বিশ্বে রোল মডেল পরিচিতি এনে দিয়েছে। সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের পাশাপাশি নারীদের সচেতনতা এ অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছে।

বাংলাদেশে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নারী নেতৃত্ব দেশ পরিচালনা করছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার নারী। এমন নজির পৃথিবীতে হয়ত দ্বিতীয়টি আর নেই। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে ৭ম স্থানে। জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে সংরক্ষিত আসন ও নির্বাচিত ২২ জনসহ ৭২ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। স্থানীয় পর্যায়ে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিও আছেন ১২ হাজার জনেরও বেশি।

নারী উন্নয়নের অন্যতম সূচক হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ। বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৮ শতাংশ। বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো তৈরি পোশাক খাত। এ খাতের মোট শ্রমিকদের ৭০ শতাংশের বেশি নারী। আবার দেশের বৃহত্তম সেবা খাত হলো স্বাস্থ্যসেবা। এ খাতেও কর্মরতদের মধ্যে ৭০ শতাংশেরও বেশি নারী। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মতে, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদান প্রায় ২০ শতাংশ।

নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সারা দেশে ৩৫টি বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তথ্য আপা প্রকল্প তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীকে ক্ষমতায়ন করছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১০ লাখ ৪০ হাজার দুস্থ নারীকে ভিজিডি এবং প্রায় ১১ লাখ মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে মাতৃত্ব ও ল্যাক্টেটিং মা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল সৃষ্টি করেছে। ফলে নারীর ক্ষমতায়নে, নারী উন্নয়নে বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। নারীদের যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার নারী শিক্ষার বিস্তার, অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়নসহ নারীর প্রতি সবধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের ফলে নারী উন্নয়ন আজ সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। ব্যাবসাবাণিজ্য, রাজনীতি, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, কূটনীতি, সশস্ত্রবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী, শান্তিরক্ষা মিশনসহ সবক্ষেত্রে নারীর সফল অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

মোতাহার হোসেন: লেখক ও সাংবাদিক, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

শুদ্ধাচারের সকল রীতি
দেশ গড়ার মূলনীতি

পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধুর বহুমুখী ভাবনা ও সময়োপযোগী উদ্যোগ

নাজমুল হুদা

বাংলার মাটি, মানুষ, পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি ছিল বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম প্রেম, গভীর মমতা ও নিবিড় ভালোবাসা। তাইতো দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন দেশকে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সুজলা সুফলা স্বপ্নের স্বর্গের ভূমিরূপে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাকে কী করে গড়ে তুলবেন? বিদেশি এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার আছে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলার মাটি আর আছে সোনার মানুষ। এই দুই দিয়েই আমি সোনার বাংলা গড়ব।'

স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ঘোড়দৌড় বন্ধ করে সেখানে গাছ লাগিয়ে বঙ্গবন্ধু এর নাম দেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। ঐ বছর ১৬ই জুলাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ কর্মসূচি উদ্‌বোধনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য। বঙ্গোপসাগরের পাশ দিয়া যে সুন্দরবনটা রয়েছে, এটা হলো বেরিয়ার, এটা যদি রক্ষা করা না হয়, তাহলে একদিন খুলনা, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ পর্যন্ত এরিয়া সমুদ্রে তলিয়া যাবে এবং হাতিয়া ও সন্দ্বীপের মতো আইল্যান্ড হয়ে যাবে। একবার সুন্দরবন যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে সমুদ্র যে ভাঙন সৃষ্টি করবে সেই ভাঙন থেকে রক্ষা করার কোন উপায় আর নাই।

জাতির পিতা তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে সুন্দরবন তথা উপকূলীয় অঞ্চলের গুরুত্ব অনুধাবন করে বন্যপ্রাণী রক্ষা আইন প্রণয়নসহ জলাভূমি রক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন করে বহুমুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা ও উদ্যোগের সুফল পাচ্ছে আজকের বাংলাদেশ। ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই সুন্দরবন আমাদের রক্ষায় আজও দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো। তিনি উপকূলীয় এলাকাকে সবুজায়ন করার প্রয়াসে উপকূলীয় বনায়ন শুরু করেছিলেন। এমনকি আজকের বাংলাদেশের রাস্তার দুপাশে যে সারি সারি বৃক্ষরাজি আমাদের প্রকৃতিকে অপরূপ ও দৃষ্টিনন্দন করেছে, এর সূচনা হয়েছিল জাতির পিতার হাত ধরেই। গণভবন ও বঙ্গভবনে গাছ লাগিয়ে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং দেশজুড়ে শুরু করেন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। সেই সাথে বাড়ির আশপাশে, পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণের জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী প্রজ্ঞায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের বিষয়কে অধিক গুরুত্বারোপে আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বর্তমান ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।' দেশের বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বঙ্গবন্ধু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। ঐ আইনের মাধ্যমেই দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১লা জুলাই ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন যা উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ ও গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এটি পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের উদ্ভিদ প্রজাতির উপর মাঠপর্যায়ে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্তসহ শুষ্ক উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ ও শ্রেণিবিদ্যা বিষয়ক গবেষণার একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এ হার্বেরিয়াম।

দেশের হাওর, নদনদী ও জলাভূমি রক্ষার প্রতিও জোর দেন বঙ্গবন্ধু। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লব সফল করতে নদীমাতৃক আবহমান বাংলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন ইত্যাদি দুর্যোগ প্রতিরোধে বঙ্গবন্ধু কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

প্রকৃতির বিরূপ আচরণ মোকাবিলায় পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণে বঙ্গবন্ধু ইপিওয়াপদার পানি উইং আলাদা করে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তায় ১৯৭২ সালেই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে অভিন্ন নদীগুলোর পানির হিস্যা আদায়ে যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুই প্রথম নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ১৯৭২ সালে নেদারল্যান্ডস সরকারের সঙ্গে নদী খননের জন্য ড্রেজিংয়ের চুক্তি সম্পাদন করেন। সবুজ ও নির্মল পরিবেশ নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু সর্বত্র বৃক্ষরোপণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ শেষে উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন এবং জলাভূমি রক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ১৯৭৩ সালে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়া তিনি ১৯৭৩ সালে ওয়াটার পলিউশন কন্ট্রোল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৩ জারি করেন। ১৯৭৩ সালে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমেই মূলত স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। বাংলাদেশে মার্চ-এপ্রিল মাসে অকস্মাৎ পাহাড়ি ঢলে হাওর এলাকায় আগাম বন্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে জুলাই-আগস্ট মাসে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সময়ে জোয়ারের নোনা পানি ঢুকে উপকূলীয় এলাকায় আমন ধান তলিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন বোর্ড ও নারায়ণগঞ্জে ড্রেজার পরিদপ্তর গঠনের উদ্যোগ নেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে চারটি ড্রেজার ক্রয় করা হয়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস অ্যাম্বাসেডরকে ডেকে অকাল বন্যা ও বড়ো জোয়ারের হাত থেকে ফসল রক্ষায় স্বল্প ব্যয়ে এবং স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানের অনুরোধ করেন। ঐ বছরই নেদারল্যান্ডস থেকে একটি পরামর্শক দল হাওর ও উপকূলীয় এলাকা পরিদর্শন করে। সমীক্ষা শেষে পরামর্শক দল হাওর এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের পুরোনো প্রথা 'আফর' বা ডুবন্ত বাঁধ (Submergible Embankment) এবং উপকূলীয় এলাকায় অষ্টামাসি বাঁধ (Coastal Dyke) তৈরির একটি প্রকল্পের সুপারিশ করে, যা Early Implementation Project (EIP) নামে ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়।

১৬ই জুলাই ১৯৭২ একটি নারিকেল গাছ লাগানোর মধ্য দিয়ে রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রূপান্তরের কাজ উদ্‌বোধন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে প্রেম ও পক্ষপাতিত্ব তাঁর বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য ও লেখা থেকে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। *কারাগারের রোজনামচা* বইয়ে ১৭ই জুলাই ১৯৬৬ সালের ঘটনা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু লেখেন–

> বাদলা ঘাসগুলি আমার দুর্বার বাগানটা নষ্ট করে দিতেছে। কত যে তুলে ফেললাম। তুলেও শেষ করতে পারছি না। আমিও নাছোড়বান্দা। আজ আবার কয়েকজন কয়েদি নিয়ে বাদলা ঘাস ধ্বংসের অভিযান শুরু করলাম। অনেক তুললাম আজ। আমি কিছু সময় আরও কাজ করলাম ফুলের বাগানে।

বঙ্গবন্ধু *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে (পৃষ্ঠা ১৭১) বলেন,

> আমি একটা ফুলের বাগান শুরু করেছিলাম। এখানে কোনো ফুলের বাগান ছিল না। জমাদার সিপাহীদের আমি ওয়ার্ড থেকে ফুলের গাছ আনতাম। আমার বাগানটা খুব সুন্দর হয়েছিল।

জাতির পিতার এ প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও পরিবেশ সংরক্ষণে বহুমুখী উদ্যোগ আমাদের জন্য অনুকরণীয়; আগামীর জন্য পথনির্দেশক। সবুজায়নের চাদরে আচ্ছাদিত নির্মল পরিবেশ আর সোনার দেশের যে স্বপ্ন বপন করে গেছেন জাতির পিতা, তা বাস্তবে রূপদানের জন্য শোভিত করে নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

নাজমুল হুদা : প্রাবন্ধিক, গবেষক ও উপপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

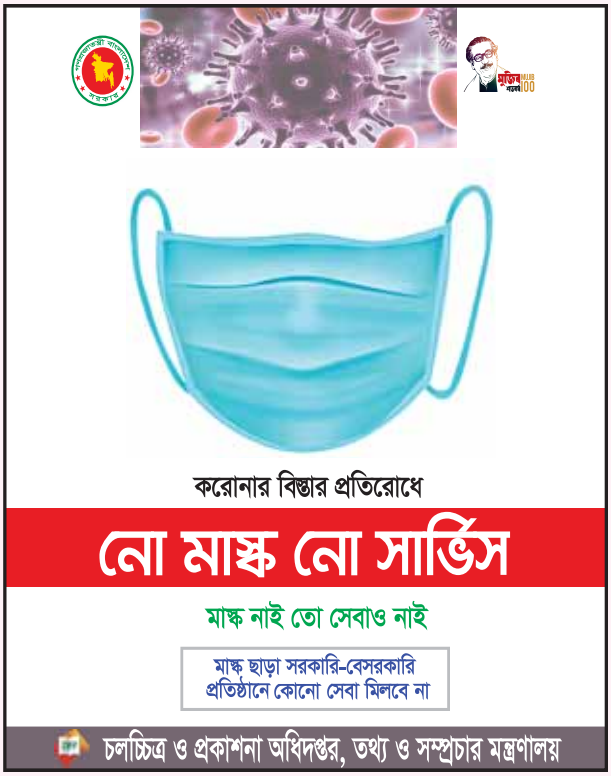

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া ৩০শে মে তথ্য ভবনের সম্মেলন কক্ষে 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২' উপলক্ষে বিশেষ সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখেন

পরিবেশ-প্রতিবেশ সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ: এখনই সময়

মরজিনা ইয়াসমিন

পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জলবায়ুর উপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ বছর তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে– 'Tobacco: threat to our environment'। প্রতিবছর ৩১শে মে বিশ্বজুড়ে তামাকমুক্ত দিবস পালিত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশ্বের ৯০ ভাগ তামাক উৎপাদন হয়। এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়– 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে।

৩০শে মে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে (ডিএফপি) অনুষ্ঠিত হলো 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২' উপলক্ষে বিশেষ সেমিনার। তথ্য ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাইফুদ্দিন আহমেদ, সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট। সেমিনারের আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ১৯৮৭ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস চালু করে। ২০০৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে জেনেভায় অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য সম্মেলনে বাংলাদেশ তামাকের নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অব টোব্যাকো কন্ট্রোল এফসিটিসি'তে প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে স্বাক্ষর করে এবং ২০০৪ সালে পুনরায় র‍্যাটিফাই করে। এফসিটিসির আলোকেই দেশে ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণীত হয়। ২০১৬ সালের ১৯শে মার্চ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক বা প্যাকেটে ৫০% স্থানে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কতা বার্তা মুদ্রণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকার সামিটে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর এ ঘোষণা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগেও বিভিন্ন জন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষাসহ সার্বিক উন্নয়নে বড়ো প্রতিবন্ধকতা 'তামাক'। তামাক চাষাবাদ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সেবনের প্রতিটি ধাপে আমাদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তামাকজাত দ্রব্য যেমন– বিড়ি, সিগারেট, তামাক, জর্দা, গুল সেবনের ফলে ফুসফুসে ক্যানসার, মুখগহ্বরে ক্যানসার, হৃদরোগ, হাঁপানিসহ বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগে প্রতিবছর বিশ্বে ১২ লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। ২০১৭ সালে Global Adult Tobacco Survey-তে দেখা যায় বাংলাদেশে ১৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সিদের মধ্যে ৩৫.৩০% মানুষ তামাকজাত পণ্য ব্যবহার করেছে, যা ২০০৯ সালে ছিল ৪৬.৩ শতাংশ। এতে দেখা যায় তামাক পণ্য ব্যবহার কিছুটা কমেছে।

বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটির 'দ্য ইকোনমিক কস্ট অব টোব্যাকো ইউজ ইন বাংলাদেশ: অ্যা হেলথ কস্ট অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক গবেষণার প্রতিবেদনে জানা যায়, তামাক ব্যবহারের কারণে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাইফুদ্দিন আহমেদ, সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট

২৬ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, যা সে বছর মোট মৃত্যুর ১৩.৫ শতাংশ। এছাড়া প্রায় ১৫ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহারজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছেন এবং প্রায় ৬১ হাজার শিশু পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তামাকের কারণে স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকা, যার ৭৬ শতাংশ তামাক ব্যবহারকারীর পরিবার মিটিয়েছে। আর ২৪% জনস্বাস্থ্য খাতের বাজেট থেকে এসেছে।

বাংলাদেশের ৪ কোটিরও অধিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার যার অধিকাংশ নারী ও শিশু। স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়ের ৯ শতাংশই পরোক্ষ ধূমপানজনিত রোগের পেছনে খরচ হয়ে থাকে। সম্প্রতি নারীদের মধ্যেও ধূমপানের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ঢাকা শহরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় শতকরা ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থীর মুখের লালাতে উচ্চমাত্রায় নিকোটিন পাওয়া গেছে, যা মূলত পরোক্ষ ধূমপানের ফল। হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগের অন্যতম কারণ এ পরোক্ষ ধূমপান।

টোব্যাকো অ্যাটলাস তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রায় ৩১ শতাংশ বন নিধনের জন্য তামাক দায়ী। তামাক চাষে ব্যবহৃত প্রচুর সার ও কীটনাশক মাটি ও পানি দূষণ করে ক্ষতিগ্রস্ত করছে দেশের মৎস্য উৎপাদন। দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদী ইতোমধ্যে হুমকির মুখে পড়েছে। সিগারেটের ফিল্টার ও ই-সিগারেটের প্লাস্টিক কার্টিজ যন্ত্রাংশ, জর্দা, গুলসহ তামাক পণ্যের প্লাস্টিক মোড়ক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষণ করে চলেছে। বিশ্বে প্রতিবছর ৮০ লক্ষাধিক মানুষ তামাকজনিত রোগে মারা যায়। বাংলাদেশেই তামাকের কারণে ১ লাখ ৬১ হাজারের বেশি মানুষ মারা যায়।

ধূমপান বন্ধে ২০০৫ সালে প্রণীত আইনে প্রকাশ্যে ধূমপানের জরিমানা ধরা হয়েছিল ৫০ টাকা। পরে ২০১৩ সালে এ আইনে সংশোধনী এনে জনসমাগমস্থলে ধূমপানের শাস্তির অর্থ বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়। কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় ও আইন না জানায় প্রকাশ্যে ও জনসমাগমস্থলে ধূমপান বন্ধ হয়নি। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের তরুণ প্রজন্ম ও অর্থনীতি। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াধীন আইন ও নীতিমালা দ্রুত পাস এবং এফসিটিসির আলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি আরও শক্তিশালী করে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। সব পাবলিক প্লেস, কর্মক্ষেত্র ও গণপরিবহণে শতভাগ ধূমপান মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (সিএসআর) কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়নের এই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হলে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আগামী প্রজন্ম, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

মরজিনা ইয়াসমিন: সহকারী পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

স্টেম (STEM) শিক্ষা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক

মো. রেজুয়ান খান

সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাথমেটিকস– এ চারটি বিষয়ের আদ্যক্ষর মিলিয়ে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে স্টেম (STEM)। বিশ্বজুড়ে বর্তমানে শিক্ষার যে ধরনটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে, সেটি হলো স্টেম এডুকেশন। উন্নত দেশগুলো মনে করছে, ভবিষ্যতে তাদের দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ধরে রাখতে হলে স্টেম এডুকেশন অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। যেসব দেশ স্টেম এডুকেশনের ওপর জোর দিবে তারাই ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

স্টেম এডুকেশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং একুশ শতকের জন্য সুশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা। স্টেম শিক্ষা মানুষের মনের সৃজনশীলতাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। মানুষের মধ্যে টিম ওয়ার্ক, উন্নত যোগাযোগ, কোনো কিছু খুঁজে বের করার দক্ষতা, কোনো কিছু বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, যে-কোনো সমস্যার সমাধান করা, সর্বোপরি ডিজিটাল জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলাই হচ্ছে STEM শিক্ষার মূল কাজ।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত STEM শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য অনন্যভাবে উপযুক্ত। STEM শিক্ষা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত শিক্ষার্থী মানসম্পন্ন STEM শিক্ষা গ্রহণ করে, তারাই পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভাবক হয়ে ওঠে। STEM শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা শিখে কীভাবে তাদের সময় পরিচালনা করতে হয় এবং কীভাবে বড়ো প্রকল্পগুলোকে ছোটো ছোটো ধাপে ভাগ করতে হয়। এটি এমন একটি পদ্ধতি, যা তাদের সারা জীবন উন্নতির জন্য সাহায্য করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্টেম শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তাদের জন্য প্রতিবছর ১৭ শতাংশ হারে কাজের সুযোগ বাড়ছে। আর অন্য ডিগ্রিধারীদের জন্য কর্মসংস্থান বাড়ছে প্রায় ১০ শতাংশ হারে। মানুষের মনে নানা জিজ্ঞাসা, কৌতূহল এবং অনুসন্ধান শুরু হয় মাধ্যমিক কাল থেকেই। শুধু পশ্চিমা দেশগুলোতেই নয়, ভারত ও চীনের মতো দেশগুলোও তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্টেম শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়। বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দনীয় তৃতীয় শিক্ষায় সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, গণিত ও প্রকৌশল ছাড়া সভ্যতা অচল। জীবনে চলার পথে প্রতিটি স্তরে রয়েছে বিজ্ঞানের প্রভাব। মানব সভ্যতায় প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ একটি জাতিকে বিকশিত করে।

স্টেম শিক্ষা একসময়কার সনাতনী নিয়মে পাঠ্যবই মুখস্থ করার প্রবণতাকে কমিয়ে এনেছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাঠ্যবই মুখস্ত করার প্রবণতা এখনও লক্ষ করা যায়। স্টেম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলে, এর প্রভাব অনেকটা কমে আসবে। যেমন– আমাদের দেশের সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে এখনকার শিক্ষার্থীরা আগেকার সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আধুনিক শিক্ষার সুফল ভোগ করতে পারছে। স্টেম শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। স্টেম সৃজনশীল সমস্যাগুলোর সমাধান করে। স্টেম অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের নতুন কিছু জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে দেয়। স্টেম

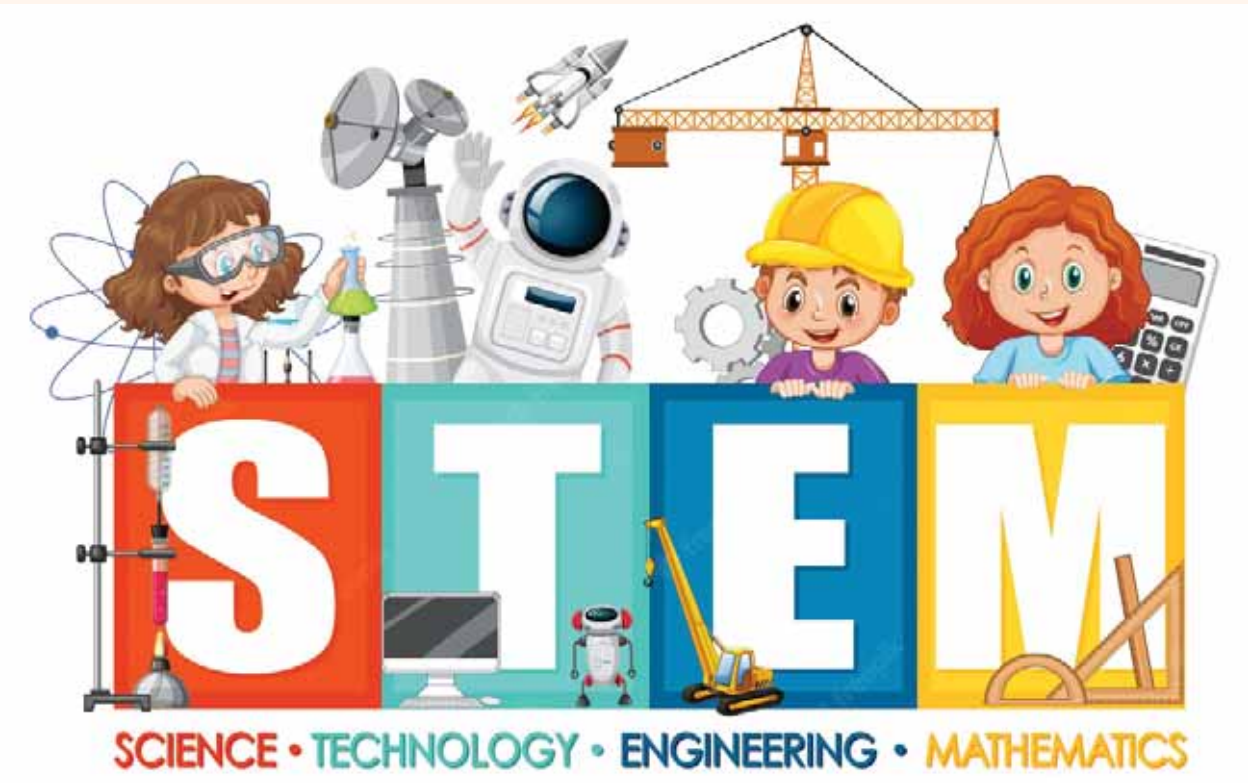

শিক্ষা একজনের সাথে অন্যজনের যোগাযোগ দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষার্থীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ জাগায় এবং অতিমাত্রায় আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি যৌক্তিক চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে।

বাংলাদেশের শিক্ষার মান আগের তুলনায় অধিকাংশে আধুনিকায়ন হয়েছে। ইনোভেশন কর্মসূচি, শিক্ষার নতুন নতুন প্রযুক্তি, গণমাধ্যমে শিক্ষা প্রদান কর্মসূচি, ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পরিচালনা এর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের স্টেম নিয়ে পড়াশোনার আগ্রহকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় স্তরের জন্য বিজ্ঞান গ্রুপে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বছরের পর বছর কমে আসছিল। কারণ হিসেবে দেখা গেল, শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান ও গণিত ভীতি। সরকার গণিত বিষয়কে শিক্ষার্থীদের মাঝে আরও আকর্ষণীয় করতে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরিবেশ গড়ে তুলেছে। মেধাবী শিক্ষার্থীরা গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। পরিপ্রেক্ষিতে গণিত বিষয়ে ভালো গ্রেড পেতে গণিত শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীরা বেশি বেশি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এভাবে গণিতের প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ভীতি অনেকটা কমে এসেছে। শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা বিকশিত করতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর নতুন উদ্ভাবনী শিক্ষাব্যবস্থা সহায়তা করছে।

বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের কাছে স্টেম এডুকেশন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে ৪৩৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ২১৬টি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে হাতেকলমে স্টেম শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (বিআইএসটি), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইএসটি), সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ঢাকা), বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি গোপালগঞ্জ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আহসানউল্যাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিসিএন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কোটবাড়ি কুমিল্লা মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ইউএসটিসি) চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি (আইএসটিটি), ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স (ইউআইটিএস) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীরা স্টেম শিক্ষা গ্রহণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাচ্ছে।

বাংলাদেশ স্টেম ফাউন্ডেশন ২০২০ সালে সারা দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে গবেষণামূলক কনসেপ্ট ও প্রজেক্ট আহ্বান করে। এ আহ্বানে শতাধিক টিমের মধ্যে ২৩৮টি প্রজেক্ট জমা পড়ে। ২০৩০ সালের ১৭টি গোলের মধ্যে ১৩টি গোল বা লক্ষ্যমাত্রাকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছিল ন্যাশনাল স্টেম কম্পিটিশন। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পয়ঃনিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানির অভাব, জলবায়ু সমস্যা সমাধান, শিল্পায়ন, পরিকল্পিত নগরায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ক কনসেপ্ট পেপার ও প্রজেক্ট উপস্থাপন করে। বিজ্ঞানভিত্তিক আইডিয়াসহ প্রজেক্ট জমাদানকারীদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে বুয়েট টিম, প্রথম রানারআপ রুয়েট টিম এবং দ্বিতীয় রানারআপ অর্জন করে চুয়েট টিম। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা স্টেম প্রতিযোগিতায় সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

স্টেম শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে 'ফার্স্ট গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ' নামের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান ২০১৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ আকর্ষণীয় রোবোটিকস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২০১৭ সাল থেকে এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশও অংশ নিয়ে আসছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ রোবোটিকস অলিম্পিকে সপ্তম স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এবারই অতিমারি করোনাভাইরাসের কারণে ফার্স্ট গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ শীর্ষক প্রতিযোগিতাটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো এ রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় এবার বাংলাদেশসহ ১৭৩টি দেশ অংশগ্রহণ করে। আনন্দের বিষয় হলো বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রোবোটিকসের অলিম্পিক হিসেবে খ্যাত আন্তর্জাতিক এ খেলায় ১৭৩টি দেশের নামকরা সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। বিশ্ব জনপ্রিয় এ রোবোটিকস অলিম্পিকে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের অবস্থানকে অনেক ঊর্ধ্বে দাঁড় করিয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বাংলাদেশে স্টেম এডুকেশনকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে আগের তুলনায় এখনকার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠছে। STEM শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক হয়ে উঠতে পারছে। STEM ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে শিক্ষার্থীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (4IR)-এর নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, STEM শিক্ষা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প–২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে বাস্তবরূপ দিতে আরও গতিশীল করবে।

মো. রেজুয়ান খান: তথ্য অফিসার, পিআইডি

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ

কে সি বি তপু

বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি স্বাধীনতা অর্জন। আর এ অর্জনের সুনিপুণ কারিগর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মূলত পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব বাংলার জনগণের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপোশহীন রাজনৈতিক জীবনে ছয় দফা শুধু তাঁর ব্যক্তিজীবনের জন্য টার্নিং-পয়েন্ট নয় বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বঙ্গবন্ধু প্রবল প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বাঙালির প্রাণের দাবি ছয় দফাকে জনপ্রিয় করেন, অপরদিকে এই ছয় দফার জনপ্রিয়তা বঙ্গবন্ধুকে শীর্ষ নেতৃত্বে উন্নীত করেছে। ছয় দফা শুধু বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে প্রভাবক নয়, প্রভাবিত করেছে বিশ্ব ইতিহাসকেও। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর আপোশহীন সংগ্রামী নেতৃত্বে ছয় দফা সংবলিত স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে সময়োপযোগী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আসে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার স্বাদ অর্জনের জন্য পূর্ব বাংলার মানুষ অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানি শাসকদের নয়া ঔপনিবেশিক শাসনে শৃঙ্খলিত হয়। বাঙালি স্বায়ত্তশাসন পায়নি, বরং পেয়েছে বৈষম্য ও নিপীড়ন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা থেকে বাঙালিদের মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের দাবি আদায়ে অবিচল থাকায় তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু এতে তিনি দমে যাননি বরং জেল-জুলুম এমনকি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাঙালিদের একত্র করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন নানারকম রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান শাসনামলে বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব সংবলিত ছয় দফা উত্থাপন করেন। এই ছয় দফাকে বাংলার জনগণের বাঁচার গণদাবিতে রূপান্তরিত করেন বঙ্গবন্ধু।

ছয় দফা কর্মসূচির আপাত লক্ষ্য এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন অর্জন কিন্তু সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল বাঙালির মুক্তি অর্জন। ছয় দফা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ঘোষিত কর্মসূচি। শেখ মুজিব এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন মূলত ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর। কেননা এ যুদ্ধে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তান প্রতিরক্ষাহীন। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে অনেকের মনে গভীর নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়।

তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সোচ্চার হন। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতারা তাসখন্দ-উত্তর রাজনীতির গতিধারা নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারি লাহোর পৌঁছান। পরদিন সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির সভায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি হিসেবে 'ছয় দফা' প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্মেলন বর্জন করে।

পশ্চিম পাকিস্তানি পত্রপত্রিকায় ছয় দফার বিবরণ ছাপিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরূপে চিত্রিত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় ছয় দফা। ছয় দফা দাবি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা গ্রহণ করতে পারেননি পশ্চিম এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতারাও। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান দমবার পাত্র নন। লাহোর ছাড়ার আগে বঙ্গবন্ধু ১০ই ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলন করে জোরালো কণ্ঠে বলেন–

> ছয় দফা আমাদের বাঁচার সনদ। তিনি যুক্তি দেন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরও জোরদার হয়েছে। পাকিস্তানকে স্বনির্ভর করতে হলে সর্বোচ্চসম্ভব স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা জরুরি। বহিরাক্রমণ ঠেকাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জরুরি।

১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। বিমানবন্দরেই তিনি সাংবাদিকদের সামনে ছয় দফা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন। ছয় দফার মূল কথাই ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফেডারেল সরকার পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি সীমাবদ্ধ থাকবে এবং বাকি সব নীতি অঙ্গরাষ্ট্রগুলো প্রণয়ন ও পরিচালনা করবে। প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধাসামরিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানিয়ে সর্বপ্রথম ১৩ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের এমএ আজিজ, আবদুল্লাহ আল হারুন ও এমএ হান্নান যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানায় ১৪ই ফেব্রুয়ারি। ছয় দফার পক্ষে-বিপক্ষে সারা দেশে বক্তৃতা-বিবৃতি শুরু হয়। এমনকি ছয় দফার বিষয়ে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের চিন্তা-চেতনায় দ্বিধাবিভক্তি দেখা যায়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের পুরানা পল্টন অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা কর্মসূচির ব্যাখ্যা করেন।

১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় ছয় দফা প্রস্তাব এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ছয় দফা আওয়ামী লীগের দলীয় ইশতাহারে পরিণত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা সংবলিত ছয় দফা কর্মসূচির একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ছয় দফার সমর্থনে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধিত সভা আর কাউন্সিল অধিবেশনের মাঝের সময় বঙ্গবন্ধু বসে থাকেননি। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দান থেকে শুরু করে নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, সিলেটসহ দেশের বিচিত্র জায়গায় চষে বেড়ান ছয় দফার প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষকে বোঝাতে। এমনকি মার্চের ঐ কাউন্সিল অধিবেশনের বাইরের পরিবেশটি ছয় দফাভিত্তিক ব্যানার ফেস্টুনে ভরিয়ে তোলা হয়।

১৮ই মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে *আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি* শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। ১৯৬৬ সালে মার্চের ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখ ছিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন। এদিন কাউন্সিল সভায় পুস্তিকাটি বিলি করা হয়। দলের সিনিয়র সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্‌বোধনী অধিবেশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গীত হয়। বাঙালির বাঁচার দাবি 'ছয় দফা'কে উপলক্ষ করে আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনটি ছিল সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিনের সেই কাউন্সিল সভায় আগত এক হাজার ৪৪৩ জন কাউন্সিলর বঙ্গবন্ধুকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক ও মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করেন।

২০শে মার্চ থেকেই আবার শুরু হয় ছয় দফাকেন্দ্রিক গণসংযোগ। দ্বিতীয় দফার এই গণসংযোগ শুরু হয় ঢাকার পল্টন ময়দান থেকে। কাউন্সিল অধিবেশনের শেষ দিন অর্থাৎ ২০শে মার্চ চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় দলীয় নেতাকর্মী ও দেশবাসীর উদ্দেশে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'চরম ত্যাগ স্বীকারের এই বাণী লয়ে আপনারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দিন, দেশের জন্য, দশের জন্য, অনাগতকালের ভাবী বংশধরদের জন্য সব কিছু জেনেশুনেই আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা এবার সর্বস্ব পণ করে নিয়মতান্ত্রিক পথে ছয় দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য এগিয়ে আসছে।' এরপর মুজিব ছয় দফা নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।

তাজউদ্দীন আহমদ ও ছাত্রলীগের নেতাদের দৃঢ় সমর্থনের ফলে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচিকে দলীয় কর্মসূচি রূপে গ্রহণ করে। ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান অসাধারণ জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৪৮-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বাঙালির সীমাহীন বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে ছয় দফা ন্যায্য অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষার সুচিন্তিত দলিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী

ছয় দফার দাবি পেশের পর শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর থেকে ফিরছেন

লীগ নেতারা সারা বাংলায় সফর করে এই ছয় দফাকে বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে অভিহিত করে প্রচার করে। এই ছয় দফা দেশে অসামান্য গণজাগরণ সৃষ্টি করে, গ্রামগঞ্জে এর বার্তা পৌঁছে যায়। ছয় দফা কার্যত জনগণের দলিলে পরিণত হয়েছিল। পরে ছাত্রসমাজের ঐতিহাসিক ১১ দফা ও সত্তরের নির্বাচনি মেনিফেস্টোতেও ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাঙালি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি সংবলিত বাংলাদেশের 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে খ্যাত ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে 'জাতীয় চেতনা' সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছয় দফা ও ৭ই জুন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ছয় দফা ও ৭ই জুনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৬৬-এর এই দিনে মনু মিয়াসহ অসংখ্য শহিদের রক্তে রঞ্জিত হয় ঐতিহাসিক ছয় দফা। বাংলার গণমানুষ ৭ই জুন স্বাধিকার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সব রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী হরতাল পালন করেছিল।

ছয় দফা আন্দোলনের পথ ধরে আসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, এর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন। বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এখানেই যে, ছয় দফার সর্বাত্মক রায় ঘোষিত হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে। বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলেও পাকিস্তানি শাসকরা বিজয়ী দলকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করলে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। এসব আন্দোলনে ধ্বনিত– আমি কি তুমি কি, বাঙালি বাঙালি; তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা; বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; ইত্যাদি স্লোগান এবং জাতীয় পতাকা তৈরি ও উত্তোলন ইত্যাদিও বাঙালিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত করে।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ সর্বোপরি বিজয় অর্জন ইত্যাদি রাজনৈতিক ঘটনাবলি ধারাবাহিকভাবে সংঘটনে বঙ্গবন্ধুর কুশলতা ও দূরদর্শিতার অনুপস্থিতি ঘটলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসের গতিপথ হতো অন্যরকম। স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বের অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর অসীম নেতৃত্বগুণ ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যেই এনেছে স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু দেখিয়েছেন তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের দূরদর্শিতা।

ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে ৭ই জুন ২০২২ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা' শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ছয় দফাকে 'বাঙালির মুক্তির সনদ' আখ্যায়িত করে বলেন, এই ছয় দফার মাধ্যমেই বাঙালির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই ছয় দফার ভিত্তিতেই সত্তরের নির্বাচনে আমরা বিজয়ী হই এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করি। এই ছয় দফার ভেতরেই এক দফা নিহিত ছিল।...' জাতির পিতা সব সময় বলতেন, 'ছয় দফা মানেই এক দফা। অর্থাৎ স্বাধীনতা। আজকে আমরা সেই স্বাধীন জাতি।'

ছয় দফা দাবি ঘোষণা করার পর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি এই যে ছয় দফা দিলেন তার মূল কথাটি কী?' উত্তরে আঞ্চলিক ভাষায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আরে মিয়া বুঝলা না, দফা তো একটাই। একটু ঘুরাইয়া কইলাম।' লাহোরে পেশ করা ছয় দফা বঙ্গবন্ধুর একটু ঘুরিয়ে বলা এক দফাই হলো বাঙালির মুক্তির দফা, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার দফা। ছয় দফা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।' ছয় দফা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির গণ-অভ্যুত্থান এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছয় দফা অন্যতম একটি মাইলফলক। বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু সময়োচিত ও ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিতেন। স্বাধীনতার পথে তাঁর সেই সময়োপযোগী চিন্তার ফসলই ঐতিহাসিক ছয় দফা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দিয়ে একটি অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ। ছয় দফা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা।

কে সি বি তপু: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

ডিজিটাল ভূমি কর ব্যবস্থা অর্জন করল উইসিস পুরস্কার

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদর দপ্তরে ডিজিটাল ভূমি (উন্নয়ন) কর ব্যবস্থার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে উইসিস পুরস্কার ২০২২ গ্রহণ করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ৩১শে মে আইটিইউ'র মহাসচিব হাউলিন ঝাও ভূমিমন্ত্রীর হাতে উইসিস পুরস্কারের ট্রফি তুলে দেন। এসময় মন্ত্রী বলেন, আজকের অবস্থানে আসার যাত্রা খুব সহজ ছিল না। একসময় বাংলাদেশের পুরো ভূমিসেবা ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো ভূমিসেবা ডিজিটালাইজেশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে আজ আমরা ডিজিটাল ব্যবস্থার অংশ হয়েছি।

এসময় প্রধানমন্ত্রী ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উইসিস ফোরামকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ভূমিমন্ত্রী বলেন, উইসিস পুরস্কার অর্জনে মানুষ ও দেশের কল্যাণে আরও বেশি করে কাজ করার জন্য আমাদের কাঁধে আরও দায়িত্ব চলে এসেছে। আইসিটি খাতে বিশ্বে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত উইসিস তথা ডব্লিউএসআইএস (ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি) পুরস্কার। 'তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগ: জীবনের সকল ক্ষেত্রে কল্যাণে-ই সরকার' শীর্ষক ৭ নম্বর শ্রেণিতে সেরা প্রকল্প বা উদ্যোগ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল ভূমি (উন্নয়ন) কর ব্যবস্থা বিজয়ী হয়েছে। মোট ১৮টি শ্রেণিতে উইসিস পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: সৃজা রাণী

শহিদ জননী জাহানারা ইমাম আমাদের অহংকার

রহিমা আক্তার মৌ

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যিনি আমৃত্যু লড়াই করেছেন, যিনি একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধীদের বিচারের দাবিতে গড়ে তুলেছিলেন 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি', তিনি শহিদ জননী জাহানারা ইমাম। ১৯২৯ সালের ৩রা মে অবিভক্ত বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর গ্রামের এক রক্ষণশীল পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল আলী ও মা সৈয়দা হামিদা বেগম।

ছোটোবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন বিষয়ে জাহানারা ইমামকে প্রবলভাবে আগ্রহী করে তুলেছিলেন এক গৃহশিক্ষক। জাহানারা ইমামের স্বপ্ন ছিল বড়ো হয়ে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাবেন। তাঁর বাবা রাজিও ছিলেন। ডাকযোগে শান্তিনিকেতনে ভর্তির প্রসপেকটাসও এসে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়নি। ১৯৪১ সালের ৯ই আগস্ট পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর খবর পড়ে তাঁর শান্তিনিকেতনে যাবার স্বপ্নের মৃত্যু হয়। বয়ঃসন্ধিকালে জাহানারা ইমামের প্রধান আশ্রয় ছিল বই। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবার কল্যাণে বাড়িতে নিয়মিত আসত পত্রপত্রিকা। জাহানারা ইমামের পাঠতৃষ্ণাকে উসকে দিয়েছিল *দৈনিক আনন্দবাজার*, *অমৃতবাজার*, *আজাদ*, *ষ্টেটসম্যান*, *সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি*, *ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া*, *মাসিক ভারতবর্ষ*, *প্রবাসী*, *বসুমতি* আর *মোহাম্মদী*। তাঁর পড়াশোনার পাশাপাশি অবসর জীবনে বিনোদন বলতে শুধু কলের গান। তাঁর বাবা একটা গ্রামোফোন ও রেকর্ড কিনে আনবার পর আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কমলা ঝরিয়া, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, কনক দাস, শাহানা দেবী, যুথিকা রায়ের গান হয়ে ওঠে তাঁর বিনোদনের সঙ্গী।

বাংলা সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন একজন গৃহশিক্ষক। জাহানারা যখন ক্লাস সেভেনের ছাত্রী, গৃহশিক্ষকের কল্যাণেই সেই সময়ে টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, ভিকটর হুগো, সেলমা লেগারলফ, শেক্সপিয়র, বার্নাড শ, ন্যুট হামসুনের অনেক বইয়ের বাংলা অনুবাদ পড়েছিলেন। জাহানারা ইমামের শৈশবকালে মুসলিম পরিবারের মেয়েদের নিকট আধুনিক শিক্ষা লাভের দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। তবে তিনি তাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতা আবদুল আলীর তত্ত্বাবধানে রক্ষণশীলতার বাইরে এসে আধুনিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পিতার চাকরিসূত্রে জাহানারা ইমাম বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেন। মেট্রিক পাস করেন ১৯৪২ সালে। ১৯৪৪ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে আই.এ পাস করে ১৯৪৫ সালে ভর্তি হন কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বিএ পাস করেন ১৯৪৭ সালে। এরই মাঝে ১৯৪৮ সালের ৯ই আগস্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার শরীফ ইমামের সঙ্গে জাহানারা ইমামের বিয়ে হয়। স্বামীর চাকরি ঢাকায় হওয়ায় বিয়ের পর তিনিও ঢাকায় চলে আসেন। বাবার মতো বিবাহিত জীবনে লেখাপড়ায় তিনি প্রকৌশলী স্বামী শরীফ ইমামের দিক থেকেও উৎসাহ ও আনুকূল্য পেয়েছিলেন।

১৯৫১ সালের ২৯শে মার্চ জাহানারা ইমামের কোলজুড়ে আসে বড়ো ছেলে শাফী ইমাম রুমী। আর ১৯৫৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জন্ম হয় ছোটো ছেলে সাইফ ইমাম জামীর। ১৯৬০ সালে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৫ সালে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ করেন।

শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মময় জীবন শুরু হয় বিয়ের আগেই। ময়মনসিংহ শহরের বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। এরপর বুলবুল একাডেমি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকেন ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৬ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৮-র দিকে সে চাকরি ছেড়ে দেন। তিনি কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন।

বড়ো ছেলে রুমীর বয়স তখন ১৯ বছর। রুমী ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন দুঃসাহসী গেরিলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। রুমী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করে শাহাদতবরণ করেন। যুদ্ধের শেষ দিকে রুমী ধরা পড়েন এবং পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে শহিদ হন। অন্যদিকে স্বামী শরীফ ইমামকেও পাকিস্তানি হানাদাররা নির্মম নির্যাতন করে আহত অবস্থায় মুক্তি দেয়। নিজের অসুস্থ শরীর তাঁর উপর রুমীর এমন চলে যাওয়া সইতে পারেননি শরীফ ইমাম। বিজয়ের মাত্র তিনদিন আগে ১৩ই ডিসেম্বর শরীফ ইমাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সেদিনই তিনি হাসপাতালে মারা যান। বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শরীফ ইমামের চলে যাওয়ায় যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দটুকু জাহানারা ইমামের বিষাদে ছেয়ে যায়। বিজয় লাভের পর রুমীর বন্ধুরা রুমীর মা জাহানারা ইমামকে সকল মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে বরণ করে নেন। তখন থেকেই তিনি 'শহিদ জননী'র মর্যাদায় ভূষিত। স্বাধীনতার পর শহিদ রুমী বীরবিক্রম (মরণোত্তর) উপাধিতে ভূষিত হন।

কলেজে পড়ার সময় জাহানারা ইমাম সহপাঠী অঞ্জলির মাধ্যমেই কমিউনিজমের পাঠ নেন। অঞ্জলি তাকে এ সংক্রান্ত বইপত্র পড়তে দিতেন। কিন্তু বাবা যথেষ্ট উদার হলেও কমিউনিস্টদের পত্রিকা *জনযুদ্ধ* দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ভর্ৎসনা করেছিলেন। মেয়ে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুক এটা তিনি চাননি। স্বামী শরীফও চাননি। তাই তখন জাহানারা ইমামকে রাজনীতির পথ ত্যাগ করতে হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-

পরবর্তীকালে জাহানারা ইমামের নাম ছড়িয়ে পরে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকার জন্য। অতীতে তিনি রাজনীতি সচেতন হলেও রাজনীতিবিদ ছিলেন না, স্বামী ও বড়ো সন্তানের শহিদ হওয়া, যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁকে রাজনীতির অঙ্গনে নিয়ে আসে।

যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির দাবিতে নব্বইয়ের দশকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ১৯৯১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামি তাদের দলের আমির ঘোষণা করলে বাংলাদেশে জনবিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। বিক্ষোভের অংশ হিসেবে ১৯৯২ সালের ১৯শে জানুয়ারি ১০১ সদস্যবিশিষ্ট একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয় জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে। তাঁকেই এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। এই কমিটি ১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ 'গণ-আদালত'-এর মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের ঐতিহাসিক বিচার করে।

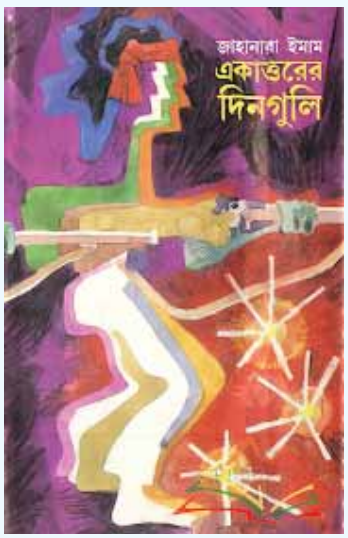

১৯৯৩ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গণ-আদালতের প্রথম বার্ষিকীতে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণ-তদন্ত কমিটি ঘোষিত হয় এবং আটজন যুদ্ধাপরাধীর নাম ঘোষণা করা হয়। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট গোলাম আযমসহ ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির আন্দোলনকে সমর্থন দেয়। জাহানারা ইমাম গণ-আদালতের রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। এই গণ-আদালতের সদস্য ছিলেন– অ্যাডভোকেট গাজিউল হক, ড. আহমদ শরীফ, মাজহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, শওকত ওসমান, লে. কর্নেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামান, লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার শওকত আলী খান।

শিক্ষকতার পেশা থেকে বেরিয়ে তিনি নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ব্যক্তিত্বময়ী জাহানারা ইমাম ষাটের দশকেই ঢাকার সংস্কৃতি মহলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি 'গার্লস গাইড', 'পাকিস্তান উইমেন্স ন্যাশনাল গার্ড', 'খেলাধুলা', 'অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন' এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ঢাকা বেতারে উপস্থাপিকা হিসেবে অনেক দিন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। জাহানারা ইমাম বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন। তিনি 'ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি মঞ্চে' শেক্সপিয়রের একটি নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন। এছাড়াও জাহানারা ইমাম ১৯৬০ সালে এডুকেশনাল বোর্ডের প্রতিনিধি হয়ে সিলেবাস সেমিনারে যান পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ারে। পাকিস্তান অলিম্পিক গেমসে খেলোয়াড়দের নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদে জুলাই ১৯৮০ থেকে জুলাই ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সদস্য ছিলেন।

ষাট ও সত্তর দশকে সাহিত্যজগতে জাহানারা ইমাম অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন শিশু-কিশোর উপযোগী রচনার জন্য। কিন্তু তাঁর সর্বাধিক খ্যাতির কারণ দিনপঞ্জিরূপে লেখা তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ *একাত্তরের দিনগুলি*। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস কেটেছে তাঁর একদিকে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ত্রাসের মধ্য দিয়ে; অন্যদিকে মনের মধ্যে ছিল দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। সেই দুঃসহ দিনগুলোতে প্রাত্যহিক ঘটনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার বৃত্তান্ত লিখেছিলেন তিনি নানা চিরকুটে, ছিন্ন পাতায়, গোপন ভঙ্গি ও সংকেতে। ১৯৮৬ সালে গ্রন্থরূপ পাওয়ার পর তা জনমনে বিপুল সাড়া জাগায়। বস্তুত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি শিহরণমূলক ও মর্মস্পর্শী ঘটনাবৃত্তান্ত হলো *একাত্তরের দিনগুলি* গ্রন্থটি।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাহানারা ইমাম লেখালেখিতে ব্যস্ত সময় কাটান। তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলো এসময়েই প্রকাশ পায়। ছোটোদের পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। ১৯৬৭ সালে *গজকচ্ছপ*, ১৯৭৩ সালে *সাতটি তারার ঝিকিমিকি* ও ১৯৮৯ সালে *বিদায় দে মা ঘুরে আসি* শিশুসাহিত্য সম্পাদনা করেন। গল্প, উপন্যাস ও দিনপঞ্জি জাতীয় রচনা মিলিয়ে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: *অন্য জীবন* (১৯৮৫), *বীরশ্রেষ্ঠ* (১৯৮৫), *জীবন মৃত্যু* (১৯৮৮), *চিরায়ত সাহিত্য* (১৯৮৯), *শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি* (১৯৮৯), *বুকের ভিতরে আগুন* (১৯৯০), *নাটকের অবসান* (১৯৯০), *দুই মেরু* (১৯৯০), *নিঃসঙ্গ পাইন* (১৯৯০), *নয় এ মধুর খেলা* (১৯৯০), *ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস* (১৯৯১) ও *প্রবাসের দিনলিপি* (১৯৯২), *বাংলা উচ্চারণ অভিধান* (যৌথভাবে সম্পাদিত) (১৩৭৫), *An Introduction to Bengali Language and Literature* (Part-I)(1983)।

জাহানারা ইমাম মূলত শিশুসাহিত্য রচনা করতেন, অনুবাদ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন বই লিখেছেন। লেখালেখির জন্যে পেয়েছেন অনেক জাতীয় পুরস্কার। স্বাধীনতা পদক (১৯৯৭), বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৮), কমর মুশতরী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৮), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১), নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা (১৯৯৪), রোকেয়া পদক (১৯৯৮), অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার (২০০১), ইউনিভার্সাল শিল্পীগোষ্ঠী পুরস্কার (২০০১) প্রভৃতি পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ১৪০১ সালের পয়লা বৈশাখ *আজকের কাগজ* তাঁকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার সম্মান দেয়। এ পুরস্কার গ্রহণের আগেই ১৯৯৪-এর ২রা এপ্রিল তিনি চিকিৎসার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হন। সেখানে হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসা চলতে থাকে। অসুস্থতার কারণে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললে ছোটো ছোটো চিরকুট লিখে প্রিয়জনদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালিয়ে যেতেন। ২৬শে জুন ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় মিশিগানের ডেট্রয়েটের সাইনাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ৬৫ বছর বয়সি শহিদ জননী জাহানারা ইমাম।

তাঁর মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি ২৮শে জুন থেকে ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত শোক সপ্তাহ এবং ৬ই জুলাই জাতীয় শোক দিবস পালন করে। ৪ঠা জুলাই বিকেলে বাংলাদেশে আসে শহিদ জননীর মরদেহ। ৫ই জুলাই সকালে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে শহিদ জননীর কফিন রাখা হয় জনগণের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে। জোহরের নামাজের পর জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর নামাজে জানাজা। জানাজা শেষে শহিদ জননীকে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধা গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। এসময় মুক্তিযুদ্ধের আটজন সেক্টর কমান্ডার শহিদ জননীকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডের কণিকা বাসভবনটি তাঁর আন্দোলন সংগ্রামঘন দিনগুলোর স্মৃতি বহন করছে।

রহিমা আক্তার মৌ: কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক

পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা জরুরি

আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

সময় বয়ে চলে নিরন্তর। আমরাও জীবন থেকে হারিয়ে ফেলছি মূল্যবান সময়। কঠিন হচ্ছে জীবনযাত্রার মান, বিলীন হচ্ছে সহজ-সরল সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো। অপেক্ষা করার আর সময় নেই, চাই নতুন প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী। একে একে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ চারদিকে নিরন্তর ছেয়ে যাচ্ছে, নীরবে সহ্য করে বসে থাকলে আমাদের গড় আয়ু ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে। এখনই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বিশেষভাবে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য বড়ো বড়ো শহর। এ ধারা অব্যাহত থাকলে একসময়ে গ্রামাঞ্চলও কলুষিত হবে, আমাদের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে পুরো বাংলাদেশ। ছোটো হয়ে আসছে পৃথিবী, যাওয়ার আর কোনো জায়গা থাকবে না। নতুন প্রজন্মকে আমরা নিজেরাই নিয়ে যাচ্ছি মৃত্যুকূপের দ্বারপ্রান্তে, তাই এ থেকে পরিত্রাণের পথ আমাদেরকেই বের করতে হবে। চাই নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে।

কলকারখানা থেকে নিঃসারিত কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ বিষাক্ত গ্যাসের পাশাপাশি প্লাস্টিক সামগ্রীর সামগ্রিক দূষণ আজ আমাদের ঘিরে ফেলছে। বনাঞ্চল একে একে উজাড় হচ্ছে, প্রকৃতির প্রাকৃতিক অক্সিজেন সাপ্লাই করা গাছ কমে পরিবেশ বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে। পানির স্তর ক্রমান্বয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে নেমে আসছে, দেশের অনেক স্থানে আজ আর টিউবওয়েল বসালেই পানি আসে না। ইট ভাটার কালো ধোঁয়া, জ্বালানি হিসেবে গাছ কর্তন এসবই বন্ধ হওয়া আজ সময়ের দাবি। আর কত দেরিতে আমরা নিরলসভাবে কাজ শুরু করব এ বিপর্যয় রুখে দিতে, আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় নেই। একটা গাছ বেড়ে উঠবে, পূর্ণতা প্রাপ্তি হবে, পর্যাপ্ত অক্সিজেন সাপ্লাই করবে– সে কি আর কম সময়ের ব্যাপার।

দেশ এগিয়ে চলছে, সবকিছু একই ধারায় প্রবাহিত হলে আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অচিরেই পা রাখতে যাচ্ছি, তাই অব্যাহত রাখা চাই এ ধারা। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে আমরা আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে চাই– যে উদ্যোগ গ্রহণ বর্তমানে অপ্রতুল। একই সাথে যদি আমরা আমাদের দৃষ্টিকে এদিকে নিবদ্ধ করতে না পারি তাহলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আমাদের উন্নয়ন আর চোখে পড়বে না।

প্রধানমন্ত্রীর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের সকলকে আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। আজ প্রায় আঠারো কোটি জনসংখ্যার এই ছোটো দেশ কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলে একবার ভাবা যায় আমাদের অবস্থা কী হতো! আমাদের কৃষিতে সময়োপযোগী পদক্ষেপের এটাই সুফল। হাঁস, মুরগি, পশুপালনে একে একে আমাদের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তাই আজ আমরা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী হাতের কাছে পাচ্ছি। এমনিভাবে আমাদের সকলকে সময় থাকতেই ভাবতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবে, সচেতনতার গণ-জোয়ার সৃষ্টি না করতে পারলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। মনে রাখতে হবে আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবী একটাই।

পৃথিবীর সর্বত্র আজ সম্মিলিতভাবে একটি উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর তা হচ্ছে– পরিবেশ বিপর্যয় থেকে আমাদের পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। এরই মধ্যে বিশ্বে আজ করোনার কালো থাবা দিনে দিনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বার বার হানা দিচ্ছে। এই বৈশ্বিক মহামারি করোনা কেড়ে নেয় লাখ লাখ প্রাণ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয় সবাইকে, বেঁচে থাকতে হচ্ছে সকলের সহযোগিতায়, সকলের সচেতনতায়। বিগত দুই বছর বিশ্বব্যাপী মানুষের চলাচল গণ্ডির ভেতরে লালিত হচ্ছে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলে আজ কিছু নেই। এ বিপৎসংকুল পরিবেশ থেকে বিশ্ব কখন পুরোপুরি মুক্তি পাবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তাই পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি একসাথে এগিয়ে নিতে হবে সম্মিলিতভাবে বিশ্বব্যাপী।

আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

দুর্নীতিকে না বলুন

আমরা সবাই মুজিবভক্ত
দেশ করব দুর্নীতিমুক্ত

RIGHT TO INFORMATION

তথ্য অধিকার

তথ্য আন্দোলনের অপরিহার্যতা

প্রাচ্য পলাশ

অস্থি-মজ্জা-রক্তে প্রবল মুক্তি যাতনার অপর নাম 'বাঙালি'। শাশ্বত ও চিরায়ত সংগ্রামের আরেক নাম 'বাঙালি'। কিংবা অপশক্তির কাছে মাথা নত না করা জাতির নাম 'বাঙালি'। হ্যাঁ, বাঙালি ব্রিটিশের অত্যাচার-নিপীড়ন-লুণ্ঠনের কাছে মাথা নত করেনি। পাকিস্তানি তীব্র শোষণ-নির্যাতনের মুখেও নুয়ে পড়েনি। তাইতো বাঙালি রক্ত দিয়ে মায়ের ভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব বিবেককে তাক লাগিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে এঁকে দিয়েছে নতুন একটি দেশ 'বাংলাদেশ'।

জাঁকজমকভাবে বিদায় দেওয়া ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ ৫০তম স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে। এ নিয়ে জাতীয়ভাবে ও বহির্বিশ্বে অবস্থানকারী বাঙালি স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে। শিশু থেকে প্রৌঢ় পর্যন্ত অনেকেই লাল-সবুজের আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি, রচনা লেখা, গল্প লেখা, চিত্রাঙ্কন, সুন্দর হাতের লেখা প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সভা-সমাবেশ, সেমিনার, গবেষণা, প্রকাশনা, পথনাটক, মঞ্চনাটক, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মারকবেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, কুচকাওয়াজ, প্রীতি ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতাসহ নানান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কনসার্ট, মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা এমনতর আরও কত কর্মসূচি।

জনগণের কাছে তথ্য বিকিরণের বহু উপায় আমাদের সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত। এগুলোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বইপুস্তক, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, চলচ্চিত্র, বিভিন্ন স্মার্ট ডিভাইস, টিভি, বেতার, ডিভিডি ও ইন্টারনেট অন্যতম। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি ব্যাপক হয়েছে। বিশেষ করে দেশের প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রায় সব ইউনিয়নে উচ্চ বিদ্যালয়, প্রতি উপজেলায় একাধিক ডিগ্রি কলেজ, প্রতি জেলায় অনার্স-মাস্টার্স কলেজ, বহু জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বইপুস্তক অনেক সহজলভ্য। মানসম্মত বেশকিছু জাতীয় দৈনিক প্রকাশনার পাশাপাশি প্রতিটি জেলা থেকে একাধিক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিনও ব্যাপক প্রকাশিত হচ্ছে, বেসরকারি টিভি স্টেশনের বিস্তার বাংলাদেশে একরকম বিস্ময়কর। এছাড়া ডিভিডি ও এফএম রেডিও প্রসারিত হয়েছে, স্মার্ট ডিভাইস ও ইন্টারনেট প্রচলনেও বাংলাদেশ বিশ্বের বহুদেশের থেকে অগ্রসর এবং চলচ্চিত্র উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

জনগণকে তথ্য দিতে বর্তমান সরকারের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। তথ্য অফিসের উদ্যোগে বহু আগে থেকেই গ্রামগঞ্জের মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়। এর পাশাপাশি সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইনের বলে সর্বস্তরের জনগণ রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও গোপনীয় তথ্য ছাড়া সব তথ্য সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে জানা যায়। দেশের ৬৪টি জেলার তথ্য বাতায়ন চালু করা হয়েছে। এছাড়া দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ই-তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করেছে। অর্থাৎ সরকার সর্বসাধারণকে তথ্য প্রদানে ভীষণ আন্তরিক।

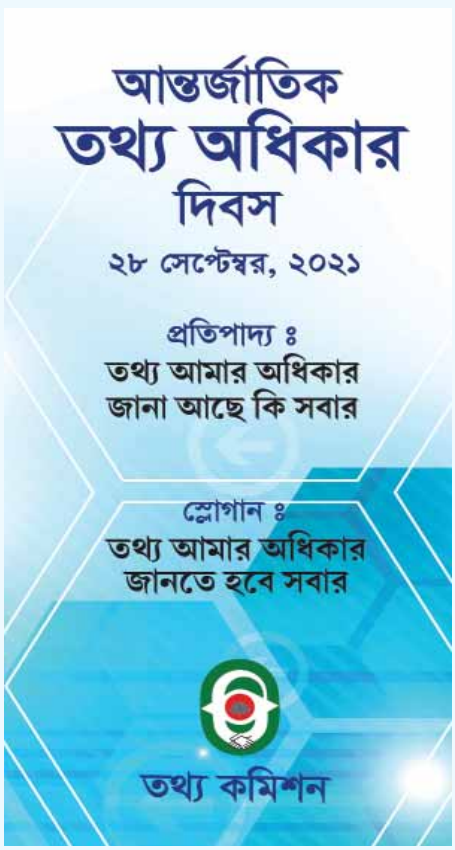

তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগে তথ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমরা স্মরণ করতে পারি পরিবার-পরিকল্পনা ও কৃষি অফিসগুলোর কার্যক্রম ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে তথ্যসমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনুরূপ নেটওয়ার্কভিত্তিক কার্যক্রম সরকারিভাবে বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। দেশবাসীকে তথ্যসমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য প্রদানে সরকারের দুই ধরনের শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালু রয়েছে। কর্মসূচি দুটো হলো– আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলোর মাধ্যমে সরকারের নেটওয়ার্কভিত্তিক কর্মসূচি শতভাগ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম।

দেশে বর্তমানে চার ধরনের গ্রন্থাগার রয়েছে। এগুলো হলো– ক. জাতীয় গ্রন্থাগার, খ. গণগ্রন্থাগার, গ. শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার ও ঘ. বিশেষ গ্রন্থাগার। জাতীয় গ্রন্থাগার প্রত্যেক দেশে একটিই

†iwR÷vW bs wW G-1

evsjv‡`k †M‡RU

AwZwi³ msL¨v

KZ…©c¶ KZ…©K cÖKvwkZ

†mvgevi, GwcÖj 6, 2009

evsjv‡`k RvZxq msm`

XvKv, 6B GwcÖj, 2009/23†k ˆPÎ, 1415

msm` KZ…©K M„nxZ wbgœwjwLZ AvBbwU 5B GwcÖj, 2009 (22†k ˆPÎ, 1415) Zvwi‡L ivóªcwZi m¤§wZ jvf Kwiqv‡Q Ges GZØviv GB AvBbwU memvavi‡Yi AeMwZi Rb¨ cÖKvk Kiv hvB‡Z‡Q t—

2009 m‡bi 20 bs AvBb

Z‡_¨i Aeva cevn Ges RbM‡Yi Z_¨ AwaKvi wbwðZKi‡Yi wbwgË weavb Kwievi j‡ÿ¨ cÖYxZ AvBb|

†h‡nZzMYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡b wPšÍv, we‡eK I evK-¯^vaxbZv bvMwiK‡Yi Ab¨Zg †gŠwjK AwaKvi wnmv‡e ¯^xK…Z.Ges Z_¨ cÖvwßi AwaKvi wPšÍv, we‡eK I evK-¯^vaxbZvi GKwU Awe‡”Q`¨ Ask; Ges

†h‡nZzRbMY cÖRvZ‡š¿i mKj ÿgZvi gvwjK I RbM‡Yi ÿgZvq‡bi Rb¨ Z_¨ AwaKvi wbwðZ Kiv AZ¨vek¨K; Ges

†h‡nZzRbM‡Yi Z_¨ AwaKvi wbwðZ Kiv nB‡j miKvix, ¯^vqËkvwmZ I msweabx ms¯’v Ges miKvix I we‡`kx A_©vq‡b m„ó ev cwiPvwjZ †emiKvix ms¯’vi ¯^”QZv I Revew`wnZv e„w× cvB‡e, `yb©xwZ nvm cvB‡e I mykvmb cÖwZôZ nB‡e; Ges

†h‡nZzmiKvix, ¯^vqËkvwmZ I msweabx ms¯’v Ges miKvix I we‡`kx A_©vq‡b m„ó ev cwiPvwjZ †emiKvix ms¯’vi ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ weavb Kiv mgxPxb I cÖ‡qvRbxq;

†m‡nZzGZ`Øviv wbgiƒc AvBb Kiv nBj t—

(2655)

g~j¨ t UvKv 12.00

থাকে। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারটি আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। গণগ্রন্থাগারের দেশব্যাপী শাখা আছে ও এগুলো থেকে সর্বসাধারণ জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। গণগ্রন্থাগারের অধিদপ্তর শাহবাগে অবস্থিত। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার স্ব স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবস্থিত, এগুলোর ব্যবহার সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন: ব্যাংক, হাসপাতাল, মসজিদ, জাদুঘর, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, পেশাজীবী সমিতি ইত্যাদি। অর্থাৎ বিদ্যমান চার ধরনের গ্রন্থাগারের মধ্যে শুধুমাত্র গণগ্রন্থাগারের মাধ্যমেই দেশবাসীকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে নেটওয়ার্কভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

দেশের ৬৪টি জেলায় গণগ্রন্থাগারের একটি করে শাখা চালু রয়েছে। আশি ও নব্বই দশকে চালু হওয়া এ জেলা শাখাগুলোর ২১টিতে সম্প্রতি পিএসসির মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কয়েক বছর আগে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকশিগঞ্জ উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে উপজেলা পর্যায়ে শাখা চালু করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার আরমানিটোলা, মোহাম্মদপুর, রাজশাহীর সোনাদীঘির মোড় ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণগ্রন্থাগারের একটি করে শাখা চালু রয়েছে। দেশের সীমান্তবর্তী জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারে বর্তমানে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় সর্বশেষ মুদ্রিত বিশ্বকোষ *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* ০১-২৯ খণ্ড, ২০০৩ সালে প্রকাশিত বাংলাকোষ *বাংলাপিডিয়া ইংরেজি* ১০ খণ্ড ও বাংলা ১০ খণ্ড, হাক্কানী পাবলিসার্স প্রকাশিত ১৫ খণ্ডের *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, নয়াদিল্লির আনমল পাবলিকেশন কর্তৃক ২০০৩ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত *এনসাইক্লোপিডিয়া অব সুফীজম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪০১ বঙ্গাব্দ শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত *রবীন্দ্র রচনাবলী বিশ্বভারতী*, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন প্রকাশিত *চিত্রমূলক বিশ্বকোষ*সহ বাংলা-ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার প্রায় ৩০ হাজার পুস্তক রয়েছে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পাঠকক্ষে ৮টি জাতীয় দৈনিক, একটি আঞ্চলিক দৈনিক, একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক ও ৬টি সাময়িকী রাখা হয়। বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত আরও ১০টি পত্রপত্রিকা, সাময়িকীও পাঠকক্ষে পাঠকদের জন্য রাখা হয়। এই গণগ্রন্থাগারে ১৯৯৩ সালের আগস্ট থেকে একটি জাতীয় দৈনিক ও একটি জাতীয় মানের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন সর্বসাধারণের জন্য নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি এ গ্রন্থাগারটিতে সার্বক্ষণিক ওয়াইফাই সুবিধা ও অফিস চলাকালীন সর্বসাধারণের ইন্টারনেট ব্রাউজ করার জন্য একটি পিসি রাখা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবসে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে। দেশের অপরাপর জেলা গণগ্রন্থাগারগুলোর চিত্র প্রায় অনুরূপ। জেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগার সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে এ বিষয়ে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও তা জেলা তথ্য অফিসের নিয়মিত প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত করা এখন সময়ের দাবি।

সহস্রাধিক বছরের লালিত বাঙালির মুক্তি আকাঙ্ক্ষা পূরণে অপরিহার্য যুগোপযোগী তথ্য আন্দোলন। তথ্য আন্দোলনের পথ ধরেই বাঙালি অচিরেই অর্জন করতে সক্ষম হবে অমর একুশে, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের লক্ষ্য ও সাফল্যমণ্ডিত সমাপ্তি। বার বার বিজয়ী বাঙালি জাতি পিছপা হবে না প্রাণের এ মুক্তির আন্দোলনে। অহিংস এ আন্দোলনে শামিল হতে রাষ্ট্রের সকলেই প্রবলভাবে দায়বদ্ধ।

প্রাচ্য পলাশ: চলচ্চিত্র নির্মাতা, *prakritatv@gmail.com*

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

কন্যাশিশুর বিয়ে প্রতিরোধ করুন

আনোয়ারা আজাদ

আমাদের সমাজে এখনও কন্যাশিশু জন্ম নিলেই একটা অন্যরকম হিসাবকিতাব শুরু হয়ে যায়। গ্রামেই হোক কিংবা শহরে, গরিব কিংবা ধনী– যেই পরিবারেই হোক না কেন, অন্য একটা হিসাব আপনাআপনি চালু হয়ে যায়! লেখাপড়া না জানা বা গরিব মানুষদের কথা পরে, অনেক লেখাপড়া জানা মানুষের কথা শুনেও হয়রান হয়েছি, হয়রান হই। যাদের দুজনই কন্যা সন্তান তারা অন্য ভাবনায় এগুলেও সমাজ তা গুরুত্ব দেয় না। সেটা বোঝা যায় কন্যাদ্বয়ের পিতৃবিয়োগ হলে। আর পিতা বেঁচে থাকলে পুত্র সন্তান নেওয়ার জন্য নিরন্তরভাবে চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখে। এদিকে যাদের পুত্র এবং কন্যা দুজনই উপস্থিত তাদেরও ভাবনার পরিবর্তন খুব একটা চোখে পড়ে না। সংসারে পুত্র এবং কন্যা দুজনের উপস্থিতি পরিবারটিতে একটি অসম ফ্লেভার ছড়িয়ে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আগে সমস্যাগুলো প্রকট থাকলেও এখন একটু হালকা-পাতলা মানে অতটা দৃশ্যমান নয়! যদিও মূল সমস্যার কোনোই অগ্রগতি নেই তবুও অনেকেই আহ্লাদ করে বলে থাকেন, মেয়েরা ঘরের শোভা, ঘরে মেয়ে না থাকলে ভালো লাগে না। আসলে এসব ফাঁকিবাজি কথাবার্তা, মন ভুলানো। আসল কথা হলো, ঘরে মেয়ে থাকলে মায়ের কাজে হাত লাগায়, ঘরে ফেরা বাপের লুঙ্গি-গামছা-তোয়ালে এগিয়ে দেয়, মেহমান এলে পানির গ্লাস এগিয়ে দেয়, খাবার বানায় ইত্যাদি সুবিধাগুলো উপভোগ করা যায়। আর পরিবারে একটু অভাব-অনটন কিংবা সামান্য কোনো সমস্যা দেখা দিলেই সেটার সমাধান করার চেষ্টা করে ঘরের শোভাকে ঘর থেকে বিদায় করে! মানে বিবাহ দিয়ে। নিজের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে বিয়ের নামে তখন চালান করে দেওয়া হয় অন্য পরিবারে শোভা বাড়ানোর জন্য! যেই পরিবারে ভাত-কাপড়ের সমস্যা নেই, সমস্যা আছে শোভা বাড়ানোর কাজ করার লোকের কিংবা বখে যাওয়া পুত্রটিকে গোয়ালঘরে বাঁধার! আর নয়তো কোনো বিপত্নীকের ভাত রেঁধে দেওয়ার বিষয়টি সমাজের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকলে! ঘর সংসার সামলানো, ভাত রেঁধে খাওয়া পুরুষের জন্য কঠিনতর একটি কাজ! নারী সব সামলে নেয়! পুঁচকে কন্যাটিও পারে! কন্যা তখন পরিপূর্ণ নারী হয়ে যায়! তো ভাত-কাপড়ের বিনিময়ে ছোট্ট কন্যাটির ঘাড়ে যাবতীয় গৃহস্থালি ও নিজেদের উচ্ছন্নে যাওয়া পুত্র/পুত্রের বাবাটির দায়িত্ব চাপিয়ে পরকালের সুখ-সমৃদ্ধির চিন্তায় খুব সহজেই বিভোর হয়ে যাওয়া যায়! নারী তুমি জন্মই নিয়েছ বলির পাঠা হওয়ার জন্য! তোমার স্বপ্ন, তোমার জীবন সব মিথ্যা! এভাবে ভাবলে চলবে না। রুখে দাঁড়াও নারী। এছাড়া তোমার পথ নেই।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় বাল্যবিবাহ রোধে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ে শূন্যের কোঠায় নামানোর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দিয়েছিল। যদিও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) সর্বশেষ জরিপ বলছে, বর্তমানে দেশে ১৫ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ের হার ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

আমার পরিচিত এক ড্রাইভার সেদিন তার একমাত্র বোনের কথা শুনিয়েছিল। সাত ভাইয়ের একমাত্র পারুল বোন! খুব সখ করে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাত্রের ইচ্ছায়। তবে পাত্রের মায়ের পছন্দ ছিল না। যা হয়। শুরু হলো নির্যাতন। একটা সময়ে বোনটিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলো ভাইয়েরা। দুটো সন্তানও জন্ম দিয়েছিল বোনটি। কিন্তু নির্যাতনের মাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে বোনটি সন্তান ছাড়াই চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। পরবর্তীতে এই বোনটি কাতারে চলে গিয়েছিল কাজ করার জন্য। জানিয়েছে, কাতারে সে যে বাড়িতে আছে খুব ভালো আছে। একবছরের মাথায় ভাইদের টাকা পাঠিয়েছে নিজের জন্য ঘর উঠানোর। বোনটির পরিকল্পনা পাঁচ বছর কাজ করে সে দেশে ফিরে আসবে। নিজের টাকায় করা বাড়িতে থেকে হাঁস-মুরগির খামার করবে।

ভাবুন এই জায়গাটা। বছর ঘুরে কোলে বাচ্চা নিয়ে অনেক মেয়েকেই ফিরতে হচ্ছে। ফেরার পর কী হচ্ছে ভাবুন? আরেকজনের দায়িত্ব কাঁধে হিমশিম অবস্থা। নিজেই সে একজন বালিকা তার ওপর কোলে শিশু। অনেককে ফিরতে হয় যৌতুকের চাপ সহ্য করতে না পেরে। তাদের জগৎ কীভাবে পালটে যায়, ভাবুন? তাহলে শিক্ষিত হোক কিংবা মূর্খ, লেখাপড়া না জানা গরিব যেই হোক না কেন, বিয়ের রঙিন স্বপ্নে অযথা দিগভ্রান্ত না করে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী আগে কাজ করতে আগ্রহী করে তুলতে হবে। তাই করজোড়ে অনুরোধ, কন্যাদের আগে নিজের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে দিন। উপার্জন করতে দিন, নিজেকে মানুষ বলে যেন ভাবতে পারে সেভাবে প্রস্তুত করুন। তুমি মেয়ে, তুমি মেয়ে– এই ভাবনায় বুঁদ না হয়ে, তুমি মানুষ এই ভাবনায় বড়ো করতে চেষ্টা করুন। মানুষ হওয়ার ভাবনাটাকেই প্রাধান্য দিন। কিছুটা হলেও তো মেয়েরা সচেতন হয়েছে, ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারে। মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য করার মানসিকতায় নেই এখন। অনেক মেয়ে নিজেরাই প্রতিবাদ করে বিয়ে ঠেকানোর দৃষ্টান্ত রেখেছে।

অনেকেই মেয়েটির নিরাপত্তার কথা ভেবে বিয়ে দেয়। সবই পুরোনো ধারণা। পুরোনো ধারণাগুলো পেছনে রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিন এখন। মেয়েটিকেও ঐ একইভাবে কাজে লাগিয়ে মানসিক শক্তি জোগাতে সাহায্য করুন। বিয়েতে যে টাকা খরচ করবেন সেই টাকা দিয়ে মেয়েটিও ছোট্ট একটি দোকান দিয়ে উপার্জন করতে পারে। কিছু মেয়ে করছেও তাই। সংসারে উপার্জনের ভার ছেলেরাই নিতে পারবে, মেয়েরা পারবে না– এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। মেয়েরা সব পারে। সন্তান জন্মদানের দায়িত্ব যাদের কাঁধে তারা সব পারবেই। তাই অন্যের সংসারের জন্য প্রস্তুত না করে মেয়েটিকে নিজের মতো করে বাঁচতে শিক্ষা দিন। সবশেষে অভিভাবকদের বলব, যারা ইতোমধ্যেই বাল্যকালেই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিবেন না। শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা মানুষের মনে শক্তি জোগায়। যে দেশে মেয়েদের শিক্ষিতের হার যত বেশি, সেই দেশ তত বেশি উন্নত। অপরিণত বয়সে বিয়ে ঠেকানোর জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে মেয়েদেরকেই। একইসঙ্গে কন্যা শিশুর বিয়ে প্রতিরোধে অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে আন্তরিকভাবে।

আনোয়ারা আজাদ: কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

ইভটিজিং প্রতিরোধে সরকারের কার্যক্রম

সুরাইয়া শিমুল

ইভটিজিং বা নারী উত্ত্যক্তকরণ বলতে কোনো নারী, যুবতী, কিশোরী বা মেয়ে শিশুকে তার স্বাভাবিক চলাফেরায় বাধাদান, চলার পথে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা অবস্থায় অশ্লীল বা অশালীন মন্তব্য করা, যে-কোনো ধরনের ভয় প্রদর্শন, তার নাম ধরে ডাকা বা বিকৃত নামে তাকে সম্বোধন, চিৎকার চেঁচামেচি করা, তার দিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো কিছু ছুড়া, ব্যক্তিত্বে লাগে এমন ধরনের মন্তব্য করা, যোগ্যতা নিয়ে টিটকারি করা, তাকে নিয়ে অহেতুক হাস্যরসের উদ্রেক করা, রাস্তায় হাঁটতে বাধা দেওয়া, অশ্লীল বা অশালীন অঙ্গভঙ্গি করা, ইঙ্গিতপূর্ণ ইশারা দেওয়া, সিগারেটের ধোঁয়া গায়ে ছুড়া, উদ্দেশ্যমূলকভাবে পিছু নেওয়া, অশ্লীলভাবে প্রেম নিবেদন করা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে গান-ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করা, চিঠি লেখা, পথ রোধ করে দাঁড়ানো, প্রেমে সাড়া না দিলে হুমকি প্রদান ইত্যাদি। সাধারণত কিশোরী মেয়ে, মেয়েশিশু, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছাত্রী, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিক, আইনজীবী, সাংবাদিক, ডাক্তারসহ সর্বস্তরের নারীরা ইভটিজিংয়ের শিকার হন। এছাড়া পাবলিক পরিবহণে বিশেষ করে বাস, ট্রেন, সিএনজি অটোরিকশায়ও নারীরা ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছেন। ইভটিজিং রোধে সরকার এখন কঠোর অবস্থানে।

১৩ই জুন ইভটিজিং বা নারী উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ দিবস। প্রতিবছর বখাটেদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইভটিজিং বা নারী উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ইভটিজিং নারীকে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাদের অবাধ চলার স্বাধীনতায় বাধার সৃষ্টি করে। কেড়ে নেয় একটি নারীর প্রাণচঞ্চলতা। ইভটিজিংয়ের কারণে ঝড়ে পড়ে অনেক কন্যাশিশু, কিশোরী ও নারী। কন্যাশিশুরা বঞ্চিত হয় শিক্ষা থেকে ফলে বাল্যবিবাহ বেড়ে যায়।

ইভটিজিংয়ের পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো:

- সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়;
- নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব;
- ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার;
- সন্তানের বেড়ে ওঠায় মাতা-পিতার অসচেতনতা;
- ধর্মীয় শিক্ষার অভাব;
- অসৎ সঙ্গ, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব ও শিক্ষার অভাব ইত্যাদি।

সরকার ইভটিজিংয়ের প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য আইন পাস করেছে, যাতে অর্থদণ্ডের পাশাপাশি কারাদণ্ডেরও বিধান রাখা হয়েছে। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ইভটিজিং-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আইনি ধারাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

দণ্ডবিধি আইন ১৮৬০-এর ৫০৯ ধারায় ইভটিজিং সম্পর্কে বলা হয়েছে–

যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে সে নারী যাহাতে শুনিতে পায় এমনভাবে কোন কথা বলে বা শব্দ করে

কিংবা সে নারী যাহাতে দেখিতে পায় এমনভাবে কোন অঙ্গভঙ্গি করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে, কিংবা অনুরূপ নারীর গোপনীয়তা অনাধিকার লঙ্ঘন করে, তাহা হইল সে ব্যক্তি এক (১) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৭৬ ধারায় বলা হয়েছে–

যদি কেউ কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বা সেখান হতে দৃষ্টিগোচরে স্বেচ্ছায় এবং অশালীনভাবে নিজদেহ এমনভাবে প্রদর্শন করে যা কোন গৃহ বা দালানের ভেতরে থেকে হোক বা না হোক কোন মহিলা দেখতে পায় বা স্বেচ্ছায় কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোনো নারীকে পীড়ন করে বা তার পথ রোধ করে বা কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোন অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, অশ্লীল আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য করে কোনো মহিলাকে অপমান বা বিরক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৭৫ ধারায় বলা হয়েছে–

সর্ব সমাজে অশালীন বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শাস্তি হিসেবে তিন মাস মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৪ ধারায় বলা হয়েছে–

যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর শালীনতা নষ্ট করার অভিপ্রায় বা সে তদ্বারা তার শালীনতা নষ্ট করতে পারে জেনেও তাকে আক্রমণ করে বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে তাহলে সে ব্যক্তি দুই (২) বৎসর পর্যন্ত যেন কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে বা জরিমানাদণ্ডে বা উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৯ (খ) ধারায় বলা হয়েছে–

যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর বা শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৯ ধারা অনুযায়ী–

যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন। ধর্ষণ পরবর্তী নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডের দণ্ডনীয় হইবেন।

ইভটিজিং বন্ধে করণীয়

১. পরিবারের সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ইভটিজিং বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. যেসব কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী কর্মীরা একসঙ্গে কাজ করেন, সেসব কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীরা নারী সহকর্মীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪. সড়কে চলাচলকারী সাধারণ মানুষ নারী উত্ত্যক্তকরণ বা ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

৫. প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবায় মসজিদের ইমাম সাহেব ইভটিজিংয়ের ব্যাপারে বয়ান রাখতে পারেন।

৬. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মাধ্যমে ইভটিজিংবিরোধী সভা, সমাবেশের আয়োজন করতে পারেন। এতে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে।

৭. স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ইভটিজিংয়ের ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা নিতে হবে। ইভটিজিং যে বা যারা করবে তাদের আইনের হাতে সোপর্দ করার পদক্ষেপ নিতে হবে জনপ্রতিনিধিদের।

ইভটিজিং প্রতিরোধে বর্তমান সরকার অনেক আন্তরিক। সরকার শিশুর সহায়তায় ফোন ১০৯৮ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ১০৯ হেল্প লাইন খুলেছে। যে কেউ এতে ফোন করলে সাথে সাথে তাকে উদ্ধার করতে পৌঁছে যাবে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইনি লোক। ন্যাশনাল হেল্প ডেস্ক ৯৯৯ তো আছেই। ধর্মীয় মূল্যবোধ, সুনীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা; সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ জোরদার করা; ইভটিজারদের সামাজিকভাবে বয়কট করা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া; ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও গণমাধ্যমের সুব্যবহার নিশ্চিত করা এবং গণমাধ্যমে ইভটিজিংয়ের কুফল ও এটি যে একটি অপরাধ, তা থেকে দূরে থাকতে হবে– এই বিষয়টি পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সমাজ এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে এবং প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করতে হবে। কোনো ধরনের ইভটিজিংয়ের ঘটনা ঘটলে সবাইকে ভিকটিমের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিকারের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, দেশের প্রতিটা নারীর অধিকার রয়েছে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার। আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে অবশ্যই আমাদের কন্যা, জায়া ও জননীদের পথচলা হবে নিরাপদ।

সুরাইয়া শিমুল: প্রাবন্ধিক

কাজী নজরুলকে বাংলাদেশে আনার সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবার বাংলাদেশে আনার সুবর্ণ জয়ন্তীর তারিখ ২৪শে মে ২০২২। ১৯৭২ সালের এই দিনে কবির ৭৩তম জন্মদিনের একদিন আগে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবার বাংলাদেশে আনেন। এ উপলক্ষে ডাক অধিদপ্তর ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট, ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্‌বোধনী খাম, ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটা কার্ড ও একটি বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করেছে। এছাড়া ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এই দিনে আয়োজিত বইমেলা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্‌বোধন এবং *'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে নজরুলের আগমন'* শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের প্রশ্নে যে দুটি মহাপ্রাণের নাম অপরিহার্যভাবে চলে আসে, তাঁরা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিদ্রোহী কবি। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন 'রাজনীতির কবি'। দুজনই স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা। একজন গণমানুষের কথা কবিতা আকারে বলে কারাবরণ করেছেন, আরেকজন কারাবরণ করেছেন গণমানুষের জন্য লড়াই করে। জাতি-ধর্ম ভেদাভেদের বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন এই দুই মহাপুরুষ। মন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় কবি ১৯৭২ সালের ২৪শে মে কবির ৭৩তম জন্মদিনের একদিন আগে ঢাকায় পৌঁছান, যেটি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য নির্ধারিত ছিল। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং কবির জন্য একটি বাংলো বাড়ি পছন্দ করে দেন এবং বাড়িটির নামকরণ করেন 'কবিভবন'। কবি ধানমন্ডির বাসভবনে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু কবিকে সম্মান জানানোর জন্য ধানমন্ডির কবিভবনে আসেন। পরে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জাতীয় কবিকে বাংলাদেশের জাতীয়তা প্রদান করা হয় এবং তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানোর জন্য 'কবিভবনে' জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

প্রতিবেদন: সীমান্ত হোসেন

মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরি

অমিত কুমার কুণ্ডু

১৯৭১ সাল। পঁচিশে আগস্ট। আজ সকালে অনেকদিন পর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললাম। গতকাল রাতে পাকিস্তানি মিলিটারিদের দুটি জিপ উড়িয়ে দিয়েছি। রশিদ ছিল এ অভিযানের প্রধান ব্যক্তি। গেরিলা অভিযানের অগ্রনায়ক।

রশিদের সঙ্গে আমার চার মাস পূর্বে দেখা। আসামের ট্রেনিং ক্যাম্পে। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। ছিপছিপে গড়নের ছেলে। চেহারায় গ্রাম্য সরলতা। বাড়ি যশোরের মনিরামপুরে। আমার সঙ্গে অল্প দিনেই বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। দেখতাম সবসময় ও কী যেন ভাবছে। একদিন ওর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, সারা দিন এত সব কী ভাবো?

উত্তরে ও বলল, ওর একটা ছেলে হয়েছে, দুই মাস বয়স, ওর জন্যেই মন কেমন করে।

আমি বললাম, এত ছোটো একটা ছেলে রেখে তুমি আসলে কেন?

রশিদ উত্তরে বলল, আমার একটা ছেলে হারালে দেশের কিছু হবে না, কিন্তু দেশ হারালে যে ছেলের কিছুই থাকবে না।

দেশ নিয়ে রশিদের এত বড়ো ভাবনা! আমি বিস্মিত হলাম! রশিদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমার অনেক বেড়ে গেল। বিকালে ট্রেনিং শেষে আমরা একত্রে বসতাম। নানা প্রসঙ্গ আসত সেসব কথায়। রশিদ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মানুষ। ছয় দফা, সত্তরের নির্বাচন, সাতই মার্চের ভাষণ, সব রশিদের নখদর্পণে। আমার ধারণা ছিল, শহরের শিক্ষিত মানুষজন এসব খবর রাখে, দেশ নিয়ে ভাবে। রশিদের সঙ্গে দেখা না হলে আমার এ ভুল ভাঙত না। রশিদ অনন্য সাধারণ। ত্যাগী। নির্লোভী।

ট্রেনিংয়ের সময় অবসর পেলে আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চরমপত্র শুনতাম। কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'– আমাদের অনুপ্রাণিত করত। দেশটাকে মায়ের মতো ভেবেছি। রশিদের ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা মিলে যেত। আমাদের গল্পের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ রশিদ হেসে ফেলত। বলত, দেখ, আমার ছেলে না এ রকম করে হাসে। তাই দেখে আমরা সবাই হাসতাম। বুকটা নির্ভার লাগত।

এক মাস এভাবেই আমাদের কেটে যায়। এরপর ট্রেনিং নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আলাদা আলাদা দলে ভাগ করে যুদ্ধে পাঠানো শুরু হয়। রশিদকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবেই আমার মন কেঁদে উঠে। আমি ভেবেছিলাম রশিদের সঙ্গে আমার হয়ত আর দেখা হবে না। কিন্তু না, যখন দল অনুযায়ী নামের তালিকা দেওয়া হলো, তখন রশিদের সঙ্গে আমার নামটিও দেওয়া হলো। আমি কী যে খুশি হয়েছিলাম সেদিন!

দেশে এসে একজন কমান্ডারের অধীনে একটা ক্যাম্পে আমরা জয়েন করি। ক্যাম্পে আমাদের মতো আরও অনেক ছেলেরা ছিল। তারাও ট্রেনিং নিয়েছে। একেক জনের বাড়ি একেক জায়গায়। প্রথম দিনেই সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। ক্যাম্প কমান্ডার আমাদের কাজ বুঝিয়ে দিলেন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে যেতে শুরু করলাম। আমাদের কাজ ছিল হঠাৎ শত্রুসেনাদের ক্যাম্প আক্রমণ করে তাদেরকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। রাজাকারদের খোঁজখবর রাখা। আর গ্রাম থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে ক্যাম্পে নিয়ে আসা। রশিদ গ্রামে যেত বেশি। কোলে কোনো ছেলে শিশুকে দেখলে ও ওর ছেলের মুখ দেখতে পেত। ঠাট্টা করে গ্রামে যাবার সময় বলত, ছেলেকে দেখতে যাচ্ছি।

এভাবে দেখতে দেখতে সময় গড়িয়ে গেল। কখন যে আরও তিন মাস সময় কেটে গেল টেরই পেলাম না। একে একে আমরা বড়ো থেকে আরও বড়ো অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলাম। আমাদের হাতে বেশ কিছু ল্যান্ড মাইন চলে এল। কিছু গ্রেনেডও পেলাম। আমাদের দায়িত্ব পড়ল সেসব মাইন-গ্রেনেড দিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিদের গাড়ি উড়িয়ে দেবার। আমরা সেই প্রশিক্ষণ নিতে থাকলাম। দুই সপ্তাহ প্রশিক্ষণ নেবার পর আমাদের হাতে এক সুবর্ণ সুযোগ চলে এল। আমরা ইনফরমেশন পেলাম, এই রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর একটা বড়ো বহর যাবে। পূর্ব পরিকল্পনা মতো আমরা রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখলাম। জঙ্গলে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

কখন কনভয় আসবে? কখন গ্রেনেড বিস্ফোরণ হবে? কখন পাকিস্তানি শত্রুরা মরবে?

পাশের কলাগাছের ফাঁক দিয়ে মেশিনগানের নল বের করে অপেক্ষা করতে থাকে রশিদ ও মুকুল। উত্তম আর আলফ্রেডের হাতে থাকে হ্যান্ড গ্রেনেড। আমাদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। এখন অতন্দ্র প্রহরীর মতো অপেক্ষা। কখন খতম হবে হানাদার? অপেক্ষার বাধ ভাঙতে থাকে। প্রায় আট ঘণ্টা পর একটা জিপ এগিয়ে আসে। ল্যান্ড মাইনের উপরে জিপের চাকা উঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাইন বিস্ফোরণ হয়। আমাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ঐ জিপটি মিলিটারিদের ছিল না। এক রাজাকারের গাড়ি ছিল। মাইন বিস্ফোরণে ড্রাইভারসহ একজন রাজাকার মারা যায়। রাজাকার প্রাণ দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর কনভয় রক্ষা করে। একটু দূরে থাকা সেনা বহর বিস্ফোরণের শব্দে সজাগ হয়ে যায়। জঙ্গলি জন্তুর মতো আমাদের দিকে তেড়ে আসে। আমরা গুলি চালাতে চালাতে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যাই।

এ ঘটনায় রাজাকারদের সহযোগিতায় হানাদার বাহিনী আমাদের ক্যাম্পের খবর জেনে ফেলে। তারা বিশাল বহর নিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসে। সামনের দিক থেকে আক্রমণ করতে থাকে। আমরা গুলি ও গ্রেনেড ছুড়তে ছুড়তে ক্যাম্প খালি করে পেছনের জঙ্গল দিয়ে পালিয়ে যাই। আমাদের অস্ত্র ছিল সামান্য। প্রশিক্ষণ ছিল অল্প। বুদ্ধি, সাহস আর মনোবল নিয়ে আমাদের যুদ্ধ করতে হতো। অন্যদিকে হানাদার বাহিনী ছিল আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত। বিপদে পলায়ন আর সুযোগ বুঝে অতর্কিত আক্রমণ ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না।

তবুও আমরা নিরাপদে পালাতে পারলাম না। পালানোর সময় করিম ও রতনের পায়ে গুলি লাগে। আমরা ওই রাতেই ওদের বর্ডার পার করে শরণার্থী ক্যাম্পের হাসপাতালে ভর্তি করে দেই। ওদের দুই-একদিন সেবা-শুশ্রূষা করে বাকিরা হাই কমান্ডের নির্দেশে আর একটা ক্যাম্পে জয়েন করি।

নতুন ক্যাম্প রশিদের গ্রামের কাছেই। একদিনের হাঁটা পথ। নতুন ক্যাম্পে যোগ দেবার পর রশিদের মন বাড়ির দিকে পড়ে রইল। রশিদ একটি বারের জন্য ওর ছেলেকে দেখতে যেতে চাইল। আমাদেরও রশিদের ছেলেকে দেখতে যেতে ইচ্ছা হলো। আমরা ঠিক করলাম, আমরা সবাই একদিনের জন্য ওর গ্রামে যাব।

সিদ্ধান্ত নিয়েও যাওয়াটা একটু পিছিয়ে গেল। যাবার দিন হঠাৎ একটা নতুন নির্দেশ এল। আমরা যে রাস্তা দিয়ে রশিদের বাড়ি যাব, সে রাস্তা দিয়ে আজ মিলিটারির বহর যাবে। ওদিক দিয়ে আজ যাওয়া যাবে না। গোলাবারুদের রসদ অনেক কমে গেছে। এখন ভুল সিদ্ধান্তে বিপদ বাড়বে।

রশিদ সে কথা শুনল না। ও ঠিক করল মিলিটারির জিপ উড়িয়েই ছেলের মুখ দেখবে। হাই কমান্ডকে বিষয়টি বললে তারা রাজি হলো। আমরা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলাম। এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগিয়ে গেল। আমাদের পুঁতে রাখা মাইনে শত্রু শিবিরের দুইটা জিপ ধ্বংস হলো। ওই হামলায় পাকিস্তানি মেজরসহ ছয়জন সেনা মারা গেল। জয় বাংলা ধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো চারদিক। স্লোগান উঠল 'তোমার নেতা আমার নেতা–শেখ মুজিব শেখ মুজিব।' বঙ্গবন্ধুকে ওরা পাকিস্তানে ধরে নিয়ে গেছে। জেলে বন্দি করে রেখেছে। তবুও শেখ মুজিব আমাদের শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে। কখনও স্লোগানে স্লোগানে কখনও মনের ভেতর থেকে।

যুদ্ধে এটাই আমাদের বড়ো সাফল্য। আমরা বিজয়ের হাসি হেসে রশিদের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। জঙ্গল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পরের দিন বিকালে ওদের বাড়ি পৌঁছলাম। রশিদের বউ আমাদের দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল। রশিদ ভাবির মাথায় হাত রাখল। মুখে ওর স্মিত হাসি। চোখে অশ্রুবিন্দু টলটল করছে। রশিদ বউয়ের কোল থেকে ছেলেকে নিজের কোলে তুলে নিলো। ছেলেকে রশিদের কোলে দিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে রশিদের বউ রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আমরা রাতে রশিদের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করলাম। খাবার অতি সামান্য। কচু সিদ্ধ, লবণ আর ফেনা ভাত। যুদ্ধের মধ্যে এ খাবারই আমাদের কাছে অমৃতের মতো লাগল। কোনো রকম মানুষগুলো জীবন ধরে রেখেছে। খেয়ে, না খেয়ে। খাবার পর করিম ও অন্যান্যরা পাশের গ্রামে করিমের বাবা-মাকে দেখতে গেল। রশিদ আমাকে ছাড়ল না, আমি থেকে গেলাম।

যুদ্ধ চললেও রাতে ঘুমাতে যাবার পূর্বে দাঁত মাজার অভ্যাসটা রয়ে গেছে। সেদিনও অভ্যাস বসত একটা নিমের ডাল ভেঙে নিলাম। হাঁটতে হাঁটতে নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম। নদী রশিদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূর। হেঁটে যেতে সাত-আট মিনিট লাগে। জ্যোৎস্না রাত। ভরা পূর্ণিমা। আকাশে চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। সব কিছু বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আগে হলে সাপ-পোকামাকড়ের ভয় পেতাম। এখন আর ভয় করে না। বেশির ভাগ দিন জঙ্গলেই আমাদের রাত কাটাতে হয়। আমি নদীর ধারে মরা খেজুর গাছের গুড়ির ওপর বসে দাঁত মাজছি।

হঠাৎ দূর থেকে শুনতে পেলাম চিৎকার-চেঁচামেচি, গুলির আওয়াজ। আওয়াজটা রশিদের বাড়ির দিক থেকেই এগিয়ে আসছে। আমি ছুটতে ছুটতে রশিদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। রশিদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখি রশিদের রক্তাক্ত লাশ পড়ে রয়েছে উঠানে। পাশে ওর ছেলে চিৎকার করে কাঁদছে। আমি এক দৌড়ে রশিদের কাছে গেলাম। ওর মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। রক্ত দিয়ে গরম ভাব উঠছে। চোখ দুটো উপড়ানো। রশিদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। ওরা অতর্কিত হামলায় বীভৎসভাবে রশিদকে মেরেছে। ওর ছেলেকে কোলে তুলে নিই। তারস্বরে কাঁদছে ছেলেটি। আমি কোলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোলেই বমি করে দিলো। ছেলেটার কান দিয়ে রক্ত ঝরছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ছেলেটির কান্না থেমে গেল। অদ্ভুতভাবে নিস্তেজ হয়ে গেল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ছেলেটির মাথায় পানি দেবার কথা মনে হলো। রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলাম। পানির কলস ভাঙা। পানি গড়িয়ে ঘরের ভেতর পিচ্ছিল হয়ে গেছে। ছেলেটি তখনও আমার কোলে। আর কাঁদছে না। নড়ছে না। ওর নাকের কাছে হাত নিয়ে গেলাম। আমার বুক কেঁপে উঠল। কেউ যেন আমার গলা টিপে ধরল। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। গা-হাত-পা থরথর করে কেঁপে উঠল। ছেলেটির শ্বাস পড়ছে না। কিছুক্ষণ পূর্বেও কাঁদছিল। এখন শান্ত। বড়ো শান্ত। বমির গন্ধ নাকে আসছে। রক্তের গন্ধ নাকে আসছে। বারুদের গন্ধ নাকে আসছে। রশিদের উপড়ানো বীভৎস চোখ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি জ্ঞান হারালাম।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন সকাল। আমার পাশে কয়েকটা কুকুর জিভ লক লক করে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাকালাম। দিনের আলোয় রশিদের লাশটি আরও বীভৎস লাগছে। ক্ষতবিক্ষত। কুকুরের দল রশিদের দেহের মাংস বিভিন্ন জায়গা থেকে ছিঁড়ে খেয়েছে। আমি উঠে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘর-বারান্দা খুঁজেও আর কাউকে পেলাম না। না জীবিত, না মৃত। জ্ঞান হারানোর সময় রশিদের ছেলে আমার কোলেই ছিল। এখন সেও নেই। রশিদের বউয়ের লাশও নেই। শুধু ঘরের মেঝেতে কয়েকটা ভাঙা চুড়ি পড়ে রয়েছে।

জয় বাংলা

খান আসাদুজ্জামান

বাঙালির আত্মোপলব্ধি
আর আত্মজাগরণের
প্রথম শানিত স্লোগান হে তুমি
'জয় বাংলা'।

ব্যানারের গায়ে
হলুদ গাঁদা ফুলে আঁকা
'জয় বাংলা' তুমি
বায়ান্ন হতে সত্তরের পল্টনে
পল্টন হতে রেসকোর্সে
মিছিলে মিছিলে ছিলে
৭ই মার্চের উত্তাল তরঙ্গরূপে
বাঙালির চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে।
ছিলে প্রতিবাদের প্রোজ্জ্বল
আর সুতীব্র বহ্নিশিখারূপে।

'জয় বাংলা' তুমি
বাংলা ও বাঙালির চির জাগরণের আদি আহ্বান
'জয় বাংলা' তুমি বাংলা ও বাঙালির
নব চেতনার বিমূর্ত উচ্ছ্বাস।

হলুদ গাঁদা ফুলে আঁকা
'জয় বাংলা' তুমি
প্রতিটি বাঙালির নিশ্বাসে নিশ্বাসে
চেতনা ও বিশ্বাসে
বুকে বুকে ফুলে ওঠা
ফুঁসে ওঠা আবহমানকালের
এক সুকঠিন বুদবুদ।

বিক্ষুব্ধ ব্যানারের গায়ে
হলুদ গাঁদা ফুলে আঁকা
'জয় বাংলা' স্লোগান
তুমি ছিলে সেদিনের সংগ্রামের
সূত্রপাতে–
জেগে ওঠা বাঙালির
হাতে হাতে।
'জয় বাংলা' স্লোগান
তুমি এদিনেরও।
হে 'জয় বাংলা' স্লোগান
তোমাকে নিশানা করে
তোমাকে ঠিকানা করে
নিজ দেশ হতে গোটা বিশ্বে
পৌঁছে যায় নতুন জোয়ারে উন্মাতাল
স্লোগানে স্লোগানে আচড়ে পড়া
অবারিত সফেন ফেনিল ঢেউ।

'জয় বাংলা' স্লোগান
তুমি স্বাধিকারের, তুমি সংগ্রামের।
তুমি বিপ্লবের ক্ষুদ্র একটি বীজ হতে
আজ বিশ্ব মহিরুহ।
তোমায় বাংলাদেশ জানে
তোমায় বিশ্ব চেনে।

হে 'জয় বাংলা' স্লোগান
তুমি বিস্ফোরিত এক ফাগুন
তুমি বাঙালির হাতে হাতে
মশাল হতে মশালের এক প্রচণ্ড আগুন।

তোমার স্বীকৃতি আজ
বাঙালির চেতনায়
তোমার স্বীকৃতি আজ
সর্বোচ্চ আদালত হতে
আসে বিবেকের রায়রূপে।

হে 'জয় বাংলা'
তুমি বাঙালির স্বাধিকার
তুমি বাঙালির অধিকার
তুমি স্বাধীনতার প্রথম জয়ধ্বনি
তুমি বাঙালির শাশ্বত প্রেম
আর প্রেরণার শিখা অনির্বাণ–
'জয় বাংলা'।

তর্জনীর আভিজাত্যে হিমালয় অভিজ্ঞান

রীনা তালুকদার

তুমি নেই বলে কথা বলে ওঠে অসমাপ্ত জীবনী
অসমাপ্ত অমর জীবন ডানপিটের খেলাঘর
তনয়ার চলমান স্বপ্ন ভূমিতে
তোমারই প্রতিচ্ছবি প্রতিভাত
বাংলার আকাশে-বাতাসে ভেসে যায়
সেই কণ্ঠস্বরের অমল প্রতিধ্বনি
রণকণ্ঠের আত্মবিশ্বাসী শব্দের বিন্যাস
ছড়িয়ে ছড়িয়ে বিস্তারিত আলপথ মাড়িয়ে
সোনালি ধানের মাঠে, খালেবিলে, চরাচরে
সবুজ টিয়ার কণ্ঠ ছুঁয়ে,
কলাপাতার তাথৈ তাথৈ নৃত্য মুদ্রায়
তোমার প্রস্থান নয় বার বার জেগে থাকাই
জানান দেয় তুমি আছো
ভাগীরথীর বুকের ভেতর
ঘরে ঘরে উদ্দীপ্ত যৌবনজয়ী বীর পুরুষ
ভোর কাঁপিয়ে পূর্ব আকাশের সূর্য ওঠা অবলম্বন রৌদ্র
তপ্ত শপথে দৃঢ় মেরুদণ্ডে সুদিনের আহ্বান
সেই বজ্রকণ্ঠ বাণী অমলিন ইতিহাসজুড়ে
সবুজ-শ্যামল প্রকৃতির জায়নামাজে
ইচ্ছের বিনম্র নতজানু মানচিত্র
ছাপান্ন হাজার ভূগোলে জন ভালোবাসার ক্ষেত্র
তোমারই অমর নামে ধ্বনিত হয় জয় বাংলা
পিতা; বাঙালির স্বপ্ন চৌহদ্দিতে তুমিই খতিয়ান
তোমার শব্দ বিন্যাস সি.এস, আর.এস
তর্জনীর আভিজাত্যে হিমালয় অভিজ্ঞান।

মুজিব সোনার চান্দ

জাহানারা জানি

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে
সাত সমুদ্দুর নদীর চরে
সবুজ পাহাড় পাতার বুকে
হাসে যে সেই নাম
যেই নামেতে
বাংলাদেশের নদী বহমান
নদীর ঢেউয়ে শুনি আমি
সেই মধুরই গান
সে তো হলো বাংলা মায়ের
মুজিব সোনার চান্দ।
যাঁর সুরেতে বাঙালিদের
ছন্দে দোলে প্রাণ
সেই পাখিটির দেহে ছিল
সোঁদা মাটির ঘ্রাণ।
কোথায় গেলো সোনার ময়না
কে করবে সেই গান
ফিরে এসো বাংলার ময়না
মুজিব সোনার চান্দ।

স্বপ্ন হলো সত্যি

ইমরান পরশ

নতুন আলোয় উঠলো হেসে
বাংলাদেশের গৌরব
পদ্মা সেতু ছড়িয়েছে
হাসনাহেনার সৌরভ।

স্বপ্নদেখা বীর বাঙালির
স্বপ্ন হলো সত্যি
নতুন আলোয় উদ্ভাসিত
মিথ্যে নয় একরত্তি।

আঁধার কেটে সূর্য ওঠে
খুশির ভেলায় ভাসে
পদ্মা সেতু নাম লেখালো
নতুন ইতিহাসে।

স্বপ্ন দ্যাখেন স্বপ্ন দ্যাখেন
জাতির পিতার কন্যা
আনন্দ ঢেউ উঠলো দেশে
ছুটলো খুশির বন্যা।

কোটি প্রাণে উঠলো জোয়ার
সুর ছড়িয়ে গানে
ঢেউ উঠেছে বাংলাদেশে
আনন্দ সবখানে।

পদ্মা সেতু

আমীরুল ইসলাম

পদ্মা সেতু দাঁড়িয়ে আছে পদ্মা নদীর বুকে
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতীক সৌরভে গৌরবে।
বিশ্ববাসী স্বীকার করে অবিশ্বাস্য কাজ
নিজের টাকায় তৈরি হলো এই পদ্মা সেতু।
মুগ্ধ চোখে দেখি যখন বিস্ময়ে মন নাচে
দলবেঁধে সব মাওয়া চলো দেখব সেতু আজ।
খরস্রোতা পদ্মা নদী পদ্মা সেতুর চাপে
আজকে কেমন শান্ত, আমরা পদ্মা করি জয়।
এই যে সাহস এই যে শক্তি কে দেখালো ভাই
দেশরত্ন শেখ হাসিনার নাই তুলনা নাই।
দেশ চালানো, দেশ বাঁচানোর জন্যে লড়াই করেন
জনগণের উন্নয়নে সব করেছেন ত্যাগ।
তাঁর অবদান তাঁর সাফল্য পদ্মা সেতু তুমি
বাংলাদেশ গর্বিত আজ পদ্মা সেতুর জন্যে।
পদ্মা সেতু তুমি আমার উন্নয়নের প্রতীক
এপার-ওপার যোগাযোগে সুযোগ হবে দৃঢ়।
পদ্মা সেতু তুমি দেশের জনগণের প্রতীক
পদ্মা সেতু দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রতীক।
পদ্মা সেতু তুমি আমার জয় বাংলার প্রতীক
পদ্মা সেতু তুমি আমার বাংলাদেশের প্রতীক।

পদ্মা সেতুর পয়ার

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

পদ্মা আমার প্রাণের পদ্মা গঙ্গা নদীর কনে
হিমালয়ের পাহাড়-টিলা সখ্য সবার সনে
মানস সরোবরের মেয়ে ভারত বাংলায় এসে
সজীব করে ঘর-গেরস্থি অনেক খানিক হেসে।

একষট্টিতে রুদ্ধ হলো তার যে চলার পথ–
সেই দুখেতে আজও ম্লান, ম্লান জলের রথ
গঙ্গা নদীর মেয়েটিকে দেখেতে যদি চাও
রাজশাহী-পাবনা হয়ে মাওয়ার কাছে যাও।

মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গোয়ালন্দের মাটি
তার ছোঁয়াতে শরীয়তপুর এক্কেবারে খাঁটি
সেই মেয়েটির বুকে আজ একটি সেতু হলো
পারাপারের দুঃখনাশি কার অবদান বলো?

পদ্মাবতীর নাতনি সেই মধুমতীর মেয়ে–
শেখ হাসিনা নামটি তাঁর পয়ার যাচ্ছি গেয়ে।

রক্তে কেনা স্বাধীনতা

কাব্য কবির

বুকের তাজা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা কেনা,
দেশের জন্য প্রাণটা দিলো লক্ষ মুক্তিসেনা।
দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ জয়ে গেলো,
যুদ্ধে গিয়ে প্রাণটা হারায়, কেউবা ফিরে এলো।

গুলি, বোমায় ঝাঁঝরা হলো ওদের সারা বুক,
আর পেলো না দেখতে ওরা মা ও বোনের মুখ।
ওদের লাশের গন্ধ আজও এই বাতাসে ভাসে,
দেশের জন্য জীবন দিয়ে মরেও ওরা হাসে।

ওদের জন্য কাঁদে আকাশ, বাংলা মায়ের মাটি,
রক্তে ভেজা সেই মাটিটা সোনার চেয়ে খাঁটি।

অগ্নিস্নান

অতনু তিয়াস

আলো জ্বালবার সাধে
একমুঠো আগুন হাতে মধ্যরাতে
অন্ধকার উদ্যানে
ল্যাম্পপোস্টের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে
তোমাকে প্রার্থনা করি জোড়হাতে
ঘুমকে পাঠিয়ে নির্বাসনে
তারাদের পানে চেয়ে
ঘৃতাহুতি দিয়ে যাই নিজের অগ্নিস্নানে
ইচ্ছেরা জ্বলে জ্বলে
পরিণতি পায় যদি আলো কিংবা ছাইয়ে
কিছু তো আছেই তার মানে।

বৃক্ষ চাই

মঈনুল হক চৌধুরী

সবুজ পাতায় হলুদ ব্যাধি
যাচ্ছে পাতা মরে,
পত্রহারা গাছে পাখি
থাকবে কেমন করে।

পাতায় পাতায় আলোর নাচন
চপল হাওয়ার দোল,
জীবন জাগায় বনপাখিদের
মধুর কলরোল।

বিবেকহারা মানুষ আহা
করছে শিকার পাখি,
জীবন হলে পক্ষীহারা
দুঃখ কোথায় রাখি?

মুক্ত হাওয়ায় দম নিতে চাই
কিন্তু হাওয়া দূষণ,
ধূসর ধোঁয়া নিত্য যেন
এই শহরের ভূষণ।

বৃক্ষছায়ার নগরজীবন
হচ্ছে বিলীন ক্রমে,
কাকচক্ষু স্বচ্ছ নদী
যাচ্ছে মরে কমে।

নিতল নদী, শীতল হাওয়া
না যদি আর থাকে,
কেমন করে বাঁচবে মানুষ
কে বাঁচাবে তাকে!

বাবা আমার

দেলওয়ার বিন রশিদ

বাবা আমার আলোর জগৎ
ফুল সুরভি সুখ
বাগের শোভা স্নিগ্ধ গোলাপ
স্নেহ ভরা বুক।

বাবা আমার উদার আকাশ
বাবা সবুজ ছায়া
বাবা আমার কষ্ট দিনে
ছড়ায় অশেষ মায়া।

বাবা আমার খেলার সাথী
পাতার প্রিয় বাঁশি
বাবা আমার জীবনজুড়ে
মিষ্টি চাঁদের হাসি।

বাবা আমার ভোরের সূর্য
শক্তি সাহস প্রত্যয়
বাবা আমার চোখের তারা
বাবা আমার হৃদয়।

মেঘাচ্ছন্ন জীবন

বোরহান মাসুদ

মাটির অচেনা গভীরে তুমি কিছু না বলে চলে গেলে
অথচ তোমার স্নেহের ডাকে ধূপকাঠি আর সন্ধ্যার প্রদীপটাও
জ্বালাতে পারিনি।

আমি সকল পরাজয় কাঁধে নিলাম
তোমার সামনে দাঁড়াতে না পেরে
লজ্জায় চোখগুলো মেঘাচ্ছন্ন আকাশে লুকাই।

স্বপ্ন ভেঙে ভেঙে
বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে
আকাঙ্ক্ষা ভেঙে ভেঙে
আমাকে রেখে সময়ের ট্রেন চলে যায়।

অঙ্গীকার করেছিলাম এক সুন্দর জীবনের
আবেগের সবকটা দরজা খুলে, তাই–
তোমার কাছে বার বার চলে আসি।

তোমার সোনামুখ জ্বলে ওঠে
আমার হৃদয়ের গভীরে
আমি তখনও বুঝতে পারিনি
তোমার হৃদয়ের সুন্দরের রহস্য,
আমি বুঝতেও পারিনি
আমার নিষ্কলুষ আবেগের কথা!

তাই তোমাকে আজ দূরে রেখেই
মেঘাচ্ছন্ন জীবন পার করি।

স্মৃতির বার্তা

প্রজীৎ ঘোষ

হে আষাঢ়ের ঝিরঝিরি মেঘ!
উতল হাওয়ার মিষ্টি আবেগ
তুমি আমার ভালোবাসার
একটি নতুন ফুল;
বৃষ্টি পরশ পেলেই আমার
যায় ভেঙে সব ভুল।

রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি পড়ে
ঘরের চালে, কুঁড়েঘরে
আহ্ কী সুন্দর! রূপ মনোহর
কুমার নদীর সবুজ চরে।

এই আষাঢ়ের বাদল ধারায়
দিয়াশলাই আগুন হারায়
সূর্য মামা মুচকি হেসে
মাঝে মাঝে মুখটি বাড়ায়।

এই ঘন ঘোর কুয়াশা যেন
বইছে চারিদিকে;
সব হৃদয়ে স্মৃতির বার্তা
বর্ষা রাখে লিখে।

আমার বাংলাদেশ

রাজিয়া রহমান

আমার সোনার দেশ, আমার বাংলাদেশ
আমার প্রাণের দেশ, আমার বাংলাদেশ
জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দেশ, আমার বাংলাদেশ
তিরিশ লক্ষ শহিদের দেশ, আমার বাংলাদেশ।
বাউল জারি সারি ভাটিয়ালি পল্লিকবির দেশ
আমার বাংলাদেশ।
দোয়েল কোয়েল ময়না টিয়া
আর ধান শালিকের দেশ আমার বাংলাদেশ।
মাগো এমন দেশটি কোথায় পাব
শত নদীতে ঘেরা প্রকৃতির উর্বর ভূমি
সবুজে শ্যামলে সুশোভিত আমার এই দেশ বাংলাদেশ।
কৃষ্ণচূড়া-জুই-চামেলি-সন্ধ্যামালতী-হাসনাহেনা
রাঙিয়ে দেয় আমার সোনার দেশ।
ঝিলের জলে শাপলা পদ্মপুকুর চোখ জুড়িয়ে নেয়।
তোমার মতো এত শান্তি কোথাও নেই
সকল দেশের সেরা তুমি আমার বাংলাদেশ।

আমি আজও স্বপ্ন দেখি

সোহেল রানা

আমি আজও স্বপ্ন দেখি
নতুন আলোয় পথ খুঁজি।
বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি:
সালাম রফিক বরকত জব্বার ...

বাংলার বীর সন্তানদের বীরত্বগাথা মুক্তিযুদ্ধ;
জাহাঙ্গীর মতিউর হামিদুর
ও আবু সালেক আবু জাহিদ পুতুল শহিদুল ...

আমি আজও স্বপ্ন দেখি
ওদের চোখেই, ওদের মতোই।
আজ যারা বাংলার তরুণ-যুবা-কিশোরসমাজ
তারাই হবে আগামীর কর্ণধার।

সহোদরা

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

এ সুরমা চোখের সুরমা নয়, এ আমার কুলুকুলু বয়ে চলা নদী
এদেশের এক কোণা দিয়ে ভারত হতেই তাহার প্রবেশ
মিষ্টিকুমড়োর মতো লতিয়ে লতিয়ে বড়ো হয়েছে সিলেট অঞ্চলে
এভাবে সুরমা আজ বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।

কুশিয়ারা তার মায়ের পেটের বোন।
যমজ এ সহোদরা একসাথেই বেড়াতে এসেছিল,
তবে আর যাওয়া হয়নি জন্মস্থলে; কোনোদিন।
পেছনে তাকানো হয়ে ওঠেনি কখনো
বরং একজন আরেক জনকে হারিয়েই ফেলেছিল বহুকাল।
বোন দুই একে অন্যকে হারিয়ে অনেক কেঁদেছে,
বর্ষার বৃষ্টির মতো কেঁদে কেঁদে ভাসিয়েছে সারাটি শরীর
পাগলিনি হয়ে খুঁজেছে দুজন এখানে-ওখানে বহুদিন বহুরাত
হারানো বোনকে পাওয়ার জন্য বিধাতার কাছে কত যে প্রার্থনা
কথা নাই বার্তা নাই কিন্তু হঠাৎ একদিন
দুজন দুদিক থেকে এসে মিলে গেল স্রষ্টার দয়ায়
অবশেষে কোলাকুলি, আনন্দ কল্লোল
কালনী নামেই আরও এগিয়ে গিয়ে মেঘনা গমন।

তোমার জন্য

ফওজিয়া হুদা

আজ তুমি নেই, চলে গেছ,
দৃষ্টির আড়ালে, গোধূলির কোনো এক শেষ বিকেলে
রেখে গেছ, এক বুক কান্না।
হাত বাড়াই মুছে দিতে সেই চোখ
পারি না, তুমি আজ নাগালের বাইরে
তোমার প্রিয়, আমাদের ছোট্ট বাড়িটি
ফুল রং দিয়ে আঁকা, মায়া মমতায় ঢাকা
যেন জোনাকিদের আলো ঘর
আজ ঘিরে আছে কুয়াশায়
যেখানে আছে নীরবতার ভয়াবহ আর্ত চিৎকার
সেই চিৎকারে কেঁপে ওঠে বাড়িটি
খসে পড়ে দেয়ালের আস্তরগুলো
এ যেন তোমাকে হারানোর বহিঃপ্রকাশ
গভীর কষ্টগুলো আরও গভীরতর হয়
এখনও মাটিতে লেগে আছে ভালোবাসার ঘ্রাণ
এই ঘ্রাণের তীব্রতায় চোখ মেলে বারান্দার
গ্রিল ছোঁয়া মাধবীর ঝড়।
সবুজ পাতাগুলো মিটিমিটি হাসে
কিন্তু, খুঁজে পায় না পুরানো সেই আমাকে
কেউ আর লেখে না সেখানে জোছনা রাতের গল্প
বদলে গেছে জীবনের প্রেক্ষাপট।
আজ আমি তুমিহীন, একা পথ চলা
নিজেকে অচেনা লাগে, নির্মম কঠিন পথ
গোপনে চোখ মুছি
খুঁজে ফিরি হারিয়ে যাওয়া আমার
সেই অমূল্য আরকটিকে।

রাত জেগে রাত দেখি

রকিবুল ইসলাম

অনেক দিন হয় রাত জেগে রাত দেখি না!
কলার বাগানে বাদুড়ের ডানা ঝাঁপটানি
আখক্ষেতে ক্ষুধার্ত শেয়ালের হুক্কা হুক্কা হুয়া
কিংবা কোকিল দম্পতির শান্ত কুহুতান...
অনেক দিন শোনা হয় না!

রাতের নদীরা আমাকে পায় না ডেকে...
কী কথা বলে রাত জাগা বালুর মরুভূমি?
নীরব গাছেরাও প্রার্থনায় থাকে মশগুল
আর মৃদু বাতাসের শান্ত সংলাপের ভোর রাত
অনেক দিন দেখা হয় না!

তাই ভাবছি, আগামী কোনো এক চাঁদের রাতে
শহরকে ঘুম পাড়িয়ে চলে যাব, দূরে...
যেখানে নির্জনতার অন্ধকার নেমেছে
যেখানে প্রকৃতি মিশেছে প্রকৃতির মায়ায়...
ওরা তবে আমাকে গ্রহণ করবে তো!

নিশ্বাস নিও না কেড়ে

আবু মুসা চৌধুরী

মায়া সুনিবিড়। অমৃতের নীড়। প্রকৃতির হাসপাতাল,
উপত্যকায়। বয়ে বয়ে যায়। পবন কী উন্মাতাল।
ছায়াঘন বেলা। বিহগের মেলা। এখানে শান্তি থাকে–
নাগরিক প্রাণ। কী যে আনচান। শিরীষ তলাটা ডাকে,
গন্ধ গোকুল। একটি নকুল। উঁকি দিয়ে যায় চুপে,
সাত রাস্তার। প্রাণের বাহার। মন কেড়ে নেয় রূপে।
ধল পহরের। মিঠে আলো ফের। সি আর বি'র সুধা,
লুব্ধ বণিক। ধিক্ ধিক্ ধিক্। টাকার নগ্ন ক্ষুধা।
কেড়ে নিতে চায়। নিশ্বাস হায়। পুঁজির দানব এসে,
তাইতো এখানে। প্রতিবাদে-গানে। চেরাগ নগরী মেশে
হাতে হাত রেখে। সংকোচ ঢেকে। সোচ্চার হই, এসো–
শিরীষ তলায়। বজ্র গলায়। প্রাণে-প্রাণে-প্রাণে মেশো।

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন গণতন্ত্রের ইতিহাসে মাইলফলক

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। তাঁর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তিনি দেশে ফিরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়, বিজয় হয় গণতন্ত্রের। ১৭ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ই জুন ২০২২ বঙ্গভবনে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ উপলক্ষে উদ্‌বোধনী খাম ও স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন –পিআইডি

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪২তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তাঁকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, নানা উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও ১৯৮১ সালের ১৭ই মে ঢাকা কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে লাখো মানুষের ঢল নামে। সেদিন বাংলার জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসায় তিনি সিক্ত হন। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে সেদিন তিনি বলেন, 'সব হারিয়ে আজ আপনারাই আমার আপনজন।... বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য আমি এসেছি। আওয়ামী লীগের নেতা হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।'

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এসময় পাহাড়ি-বাঙালি দীর্ঘমেয়াদি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধে পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসে এবং জনগণের কল্যাণে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা হয়। গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি, গ্রামীণ অবকাঠামো, বৈদেশিক কর্মসংস্থানসহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু ও রায়ের বাস্তবায়নসহ সমুদ্রে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থল সীমানা নির্ধারণ তথা ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে গণমানুষের কল্যাণে নিরলস প্রয়াস চালান। ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোট সরকার টানা তিনবার ক্ষমতায় এসে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে সরকার পরিচালনা করছে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমে দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ মাথাপিছু আয় বাড়ছে, কমছে দারিদ্র্যের হার। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর কাজ প্রায় শেষের পথে। মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, কর্ণফুলী টানেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করতে তিনি 'রূপকল্প ২০২১'-এর সফল বাস্তবায়নের পথ ধরে 'রূপকল্প ২০৪১' ও 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০'-এর মতো দূরদর্শী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে শেখ হাসিনার এসব যুগান্তকারী কর্মসূচি বিশ্বে আজ রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিস্ময়কর প্রতিভা

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যকে তিনি তুলে ধরেছেন বিশ্বপরিমণ্ডলে। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, গীতিনাট্যকার, প্রবন্ধকার। সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তিনি বিচরণ করেননি। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে

তিনি মানবতার জয়গান করেছেন। ৮ই মে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মানবমুক্তি ছিল তাঁর জীবনবোধের প্রধানতম দিক। শুধু সাহিত্যসাধনা নয়, পূর্ববঙ্গের জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি দরিদ্র প্রজাসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি ও মানবিক বিকাশের জন্য তিনি নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এসব প্রয়াসের মধ্যে তাঁর মানবহিতৈষী মন ও জনকল্যাণ চেতনার গভীর পরিচয় মেলে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী অবদান রেখে গেছেন। তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির অমৃত সন্তান। তাঁর গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের প্রেরণাশক্তি। তাঁর গান, সাহিত্য ও কর্মচেতনা বাংলাদেশের মানুষকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

সাম্য, মানবতা, প্রেম ও প্রকৃতির কবি কাজী নজরুল ইসলাম

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, সাম্য, মানবতা, প্রেম ও প্রকৃতির কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অন্যতম পুরোধা। নজরুল আমাদের জাতীয় জাগরণের তূর্যবাদক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের রূপকার। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ও সৃজনশীল কর্ম আমাদের অন্তহীন অনুপ্রেরণার উৎস। কবির ক্ষুরধার অগ্নিঝরা লেখনী শোষিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার করে, শিক্ষা দেয় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী কবি। তিনি শুধু নিজের ধর্ম, সমাজ-সম্প্রদায়, দেশ ও কালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি, ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার জয়গান গেয়েছেন, নারীর অধিকারকে করেছেন সমুন্নত। তাঁর সৃষ্টি সর্বজনের, সর্বকালের। ২৫শে মে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী এবং 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে কবির গান ও কবিতা মুক্তিকামী মানুষকে অনিঃশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর লেখনী থেকেই আমরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নজরুলের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাঁকে সপরিবার বাংলাদেশে এনে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। নজরুল যে অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন, তা বাস্তবায়নে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই মে গণভবনে সফররত ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ বিজনেস ডিলিগেশনের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী সম্ভাব্য সর্বোত্তম নীতি কাঠামোর আশ্বাস দিয়ে বাংলাদেশের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী ব্যাবসা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সহজ করার জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য নীতি কাঠামো এবং সম্ভাবনার বিষয়ে আশ্বস্ত করার কথা উল্লেখ করেন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে। মার্কিন কোম্পানিগুলো এ সুবিধা গ্রহণ করবে এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, আইসিটি, অবকাঠামো, হালকা প্রকৌশল পণ্য, মোবাইল ফোন ও ইলেকট্রনিক পণ্য, অটোমোবাইল, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, ঔষধ এবং সিরামিকের মতো সম্ভাব্য খাতে আরও বিনিয়োগ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে মে ২০২২ ঢাকায় গণভবন থেকে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত UNESCAP-এর ৭৮তম অধিবেশনে রেকর্ডকৃত বক্তব্য প্রদান করেন –পিআইডি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই মে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। তিনি সরকারের সমালোচকদের শুধু খরচের দিকটা না দেখে মেগা প্রকল্পগুলো দেশের অর্থনীতিতে কতটা অবদান রাখবে তা বিবেচনা করার পরামর্শ দেন। তিনি বিশ্বজুড়ে মন্দা ও খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার আশঙ্কায় সবাইকে নিজের খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য সাশ্রয় করে এবং খাদ্যকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সকলকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশ্ব সংকট নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর চার প্রস্তাব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে মে গণভবন থেকে যুক্ত হয়ে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ (জিসিআরজি)-এর প্রথম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী সংহতি জোরদার করার এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও কোভিড-১৯ মহামারির কারণে খাদ্য, বিদ্যুৎ ও আর্থিক সংকট মোকাবিলায় সুসমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। এছাড়া বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তার দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

বৈশ্বিক মন্দাতেও দেশ এগিয়ে যাবে

বৈশ্বিক মন্দাতে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিতে দেশের মানুষকে কষ্ট থেকে দূরে রাখতে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সংকটকালেও বাংলাদেশ যে এগিয়ে যেতে পারে, তা প্রমাণিত বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। ২৬শে মে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান–২১০০ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স : ইস্যুজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অব ইমপ্লিমেন্টেশন'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালে তিনি একথা বলেন। করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকারের দেওয়া বিভিন্ন প্রণোদনার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামী প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত বাংলাদেশ নিশ্চিত করতেই ডেল্টা প্ল্যান–২১০০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে এগিয়ে আসায় নেদারল্যান্ডসকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

এশিয়ায় শক্তি একত্রিত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে মে এশিয়ায় ভবিষ্যৎ বিষয়ক ২৭তম আন্তর্জাতিক নিক্কেই সম্মেলনে এক ভিডিও বার্তায় যুক্ত হন। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য ভালো অনুশীলন, জ্ঞান ও প্রযুক্তি ভাগ করে নিতে আমাদের বাহিনীকে একত্রিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী জাপান ও ওইসিডির দেশগুলোর প্রতি বাংলাদেশকে সহজে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়শীল দেশে উত্তরণে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্তত ২০২৯ সাল পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক সুবিধাগুলো অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তিনি ভবিষ্যৎ এশিয়া গড়ার জন্য সম্মেলনে পাঁচটি ধারণা শেয়ার করেন। এছাড়া আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, টেকসই ও সমৃদ্ধ এশিয়া নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সব বন্ধু অংশীদের সঙ্গে কাজ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতন্ত্রের অগ্নিবীণার প্রত্যাবর্তন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আজ থেকে ৪১ বছর আগে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে ব্যক্তি শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনই ছিল না, ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্রের অগ্নিবীণা ও উন্নয়ন-প্রগতির প্রত্যাবর্তন। ১৭ই মে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৭ই মে প্রধানমন্ত্রীর ৪২তম ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনাসভায় তিনি এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ বিশেষ সভায় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সূচনা বক্তব্য এবং

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১১ই মে ২০২২ জাতীয় প্রেসক্লাবে ওভারসিজ করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত 'মিট দ্য ওকাব উইথ মিনিস্টার'-এ বক্তৃতা করেন –পিআইডি

আওয়ামী লীগসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বক্তব্য দেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, গত ৪১ বছরের পথ চলায় জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বদলে গেছে। গত ১৩ বছরে প্রতিটি মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বলেন, সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে, খাদ্যে ঘাটতি থেকে উদ্বৃত্তের দেশে উন্নীত করে চিরদিন দেশের মানুষের পাশে থাকা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শেখ হাসিনার হার না মানা দেশপ্রেম উল্লেখ করে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে-এর কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী হিসেবে কাজ করে আসা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, সেদিনের মুষলধারে বৃষ্টি যেন ছিল শেখ হাসিনাকে পেয়ে প্রকৃতির আনন্দাশ্রু আর মেঘ গর্জন ছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের প্রতি তীব্র ধিক্কার। শেখ হাসিনাকে বরণ করে প্রকৃতি যেন জানান দিয়েছিল– ষড়যন্ত্রকারী, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের দিন শেষ।

দেশের সঠিক চিত্রায়ণ করুন বিদেশি গণমাধ্যমে

বিদেশি গণমাধ্যমে দেশকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিনিধিদের সংগঠন ওভারসিজ করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ওকাব) সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ১১ই মে রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে 'মিট দ্য ওকাব' অনুষ্ঠানে একক বক্তৃতায় বিশ্ব গণমাধ্যমে দেশের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে ওকাবের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা করে তিনি এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে মন্ত্রণালয়ের কাজগুলো সুচারুভাবে করে যাওয়ার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন জানিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষা করা, গণমাধ্যমের অর্থবহ বিকাশ এবং সেই সাথে ভুয়া ও ভূঁইফোড় সাংবাদিক কিংবা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যাতে বৃহত্তর সাংবাদিক সমাজের বদনাম না হয় এবং সর্বোপরি সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা– এগুলোর জন্য আমি নিরন্তন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে গত বছরের ১৫ই মার্চ থেকে মন্ত্রণালয়ের নাম 'তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়' করা হয়– যা আমাদের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি বাংলাদেশে সংবাদ মাধ্যম যেভাবে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে, এটি অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ। যুক্তরাজ্যে কারো বিরুদ্ধে ভুল বা অসত্য রিপোর্ট হলে সেটির পরিপ্রেক্ষিতে মামলা হয়, সংবাদ মাধ্যমকে জরিমানা গুণতে হয়। সেখানে একজন এমপির বিরুদ্ধে অসত্য সংবাদ পরিবেশনের কারণে বিবিসির পুরো একটি টিমকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। তিন মাস আগেও একটি ভুল সংবাদ পরিবেশনের ঘটনায় বিবিসির অনেককে পদত্যাগ করতে হয়েছে। সেখানে ২০১১ সালে ১৬৭ বছরের পুরনো পত্রিকা *নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড* একটি ভুল সংবাদ পরিবেশনের কারণে তাদের ওপর আদালতের জরিমানার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, তারা পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। এ ধরনের ঘটনা কন্টিনেন্টাল ইউরোপেও হয়, আমাদের দেশে কখনো এমন ঘটে নাই। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও অর্জনের কথা তুলে ধরতে গিয়ে মন্ত্রী তার উদ্যোগে বিদেশি চ্যানেলগুলোর বিজ্ঞাপনমুক্ত সম্প্রচার সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়ন, কেবল নেটওয়ার্কে দেশি টিভি চ্যানেলগুলো সবার আগে এবং তাদের সম্প্রচারের তারিখ অনুযায়ী পরপর তাদের অবস্থান নিশ্চিত করা, ২০২০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কয়েক দফা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ ডিশ টিভি উচ্ছেদ অভিযান করে বছরে দেশের এক হাজার কোটি টাকার বেশি পাচার ও লোকসান হওয়া রোধ, বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণে দেশি শিল্পী ও শিল্পের সুরক্ষায় বিদেশি শিল্পী ও বিদেশে চিত্রায়িত বিজ্ঞাপন প্রচারের ওপর কর আরোপের কথা জানান। একইসঙ্গে বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনায় নীতি প্রণয়ন, গণমাধ্যমকর্মী আইন ও সম্প্রচার আইনের খসড়া প্রণয়ন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে করোনায় গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য বিশ্বে নজিরবিহীন সহায়তা দান, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাতে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ ও সংস্কারে এক হাজার কোটি টাকার সহজ ঋণ তহবিল গঠন, চলচ্চিত্রে সরকারি অনুদান বৃদ্ধি এবং সাংবাদিকদের ডাটাবেজ তৈরির জন্য প্রেস কাউন্সিলকে নির্দেশনা দানের বিষয়েও আলোকপাত করেন তিনি। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে দূরদর্শন ফ্রি ডিশের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু এবং ১৪ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে প্রথমবারের মতো আকাশবাণীর মাধ্যমে সমগ্র ভারতে বাংলাদেশ বেতারের দৈনিক চার ঘণ্টা সম্প্রচার এবং বাংলাদেশ বেতারে আকাশবাণীর অনুরূপ সম্প্রচার শুরুকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন বলে অভিহিত করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বৈশ্বিক মন্দা ঠেকাতে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান

বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতিতে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে রক্ষায় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব যখন কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত থেকে পুনরুদ্ধারে লড়াই করছে তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতায় বড়ো আঘাত হিসেবে হাজির হয়েছে। এ যুদ্ধের প্রভাবে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্ষতির মুখে পড়েছে। তাই এ যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় যৌথ পদক্ষেপ নিতে হবে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (এসকেপ)-এর ৭৮তম বার্ষিক সম্মেলনে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে জাতিসংঘ সম্মেলন কেন্দ্রে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে অধিবেশনটি। 'এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন অভিন্ন লক্ষ্য'– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ২৩শে মে শুরু হয়ে ২৭শে মে শেষ হয় অধিবেশনটি।

পারস্পরিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অর্জনে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে সবচেয়ে কার্যকর বিকল্প বিবেচনা করে এটি জোরদার করাসহ পাঁচটি প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রস্তাবগুলো হলো– জ্ঞান এবং উদ্ভাবন সহযোগিতাকে এগিয়ে নিতে কর্মমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ, উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পথে থাকা দেশগুলোকে আরও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক ২৯শে মে ২০২২ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২২' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শান্তিরক্ষা মিশনে দুই শহিদ পরিবার এবং সাহসিকতার জন্য ১৪ জন আহত শান্তিরক্ষীকে পদক প্রদান করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন –পিআইডি

বাস্তবসম্মত উপায়ে আন্তর্জাতিক সহায়তার ব্যবস্থা করা, জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার দেশগুলোর জন্য পর্যাপ্ত তহবিল ও প্রযুক্তি বরাদ্দে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা, আঞ্চলিক সংকট ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনে আঞ্চলিক আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং চতুর্থ বিপ্লবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কর্মসংস্থান তৈরি, তথ্যপ্রযুক্তি খাত ও তথ্যপ্রযুক্তির সেবা সম্প্রসারণ করা। এসময় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আবারও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় রোল মডেল বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস পালিত হলো ২৯শে মে। বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ মিশনে শান্তিরক্ষায় দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের সুনাম বাড়িয়ে চলেছে। নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অর্পিত দায়িত্ব পালন করে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছেন বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৪৩টি দেশের ৫৫টি শান্তিরক্ষা মিশনে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৩৭৮ জন শান্তিরক্ষী পাঠিয়ে জাতিসংঘের ইতিহাসে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

প্রতিবছর ২৯শে মে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এবার 'জনগণের অংশীদারিত্বেই শান্তি ও সমৃদ্ধি' প্রতিপাদ্য নিয়ে দিনটি পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আজ সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। জাতিসংঘ মিশন এবং বহুজাতিক বাহিনীতেও বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের অনন্য অবদান বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে এবং এ দেশকে বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। একই সঙ্গে বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

Dbqb : we‡kl cwZ‡e`b

জিআই সনদ পেল বাগদা চিংড়ি

বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে জিআই সনদ পেয়েছে বাগদা চিংড়ি। সম্প্রতি পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এ স্বীকৃতি প্রদান করে। অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার জনেন্দ্র নাথ সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, দশম পণ্য হিসেবে ভৌগোলিক নির্দেশক সনদ পেয়েছে বাগদা চিংড়ি। ২৪শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন সনদ দেওয়া হয়। তবে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে সনদটি রিসিভ করা হয়নি, তারা ডাকযোগে সনদটি পাঠিয়েছে।

বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় কালো ডোরাকাটা বাগদা চিংড়ির চাষ শুরু হয় প্রায় ১০০ বছর আগে। গত শতকের সত্তরের দশকের পর বিশ্ববাজারে চাহিদা বাড়তে শুরু করলে বাংলাদেশেও বাগদা চাষের সম্প্রসারণ ঘটে। আশির দশকে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যুক্ত হয় এ চিংড়ি। জিআই সনদ পাওয়ার

ফলে এটি আমাদের হয়ে থাকল। এটা আর কেউ ক্লেম করতে পারবে না। এই চিংড়ির কোয়ালিটি অন্যতম এবং কালার ও ফ্লেভার খুবই ভালো।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে সপ্তম বাংলাদেশ

২০২১ সালে প্রবাসী আয় প্রাপ্তিতে বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে সপ্তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ঐ বছর দেশে প্রবাসী আয় এসেছে দুই হাজার ২২০ কোটি ডলার। আগের বছরের তুলনায় প্রবাস আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২.২ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্রিফ' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে। ১০ই মে প্রকাশিত নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর প্রবাসী আয় নিয়ে এই প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে তৈরি করে গ্লোবাল নলেজ পার্টনারশিপ অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (নোমাড)।

আগের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালেও প্রবাসী আয় প্রাপ্তিতে সপ্তম স্থানে ছিল বাংলাদেশ। ঐ বছর প্রবাসী আয় এসেছিল দুই হাজার ১৭০ কোটি ডলার। তবে চলতি বছরের শেষ নাগাদ প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধির হার ২ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। ২০২৩ সালেও এই প্রবণতা থাকতে পারে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২১ সালে প্রবাসী আয় প্রাপ্তিতে সবার ওপরে রয়েছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। এরপর রয়েছে মেক্সিকো, চীন, ফিলিপাইন, মিশর ও পাকিস্তান। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ভারত ও পাকিস্তানের পরই। প্রতিবেদনে বলা হয়, মূলত সরকারি প্রণোদনা এবং দেশে পরিবারের কাছে অর্থ পাঠানোর কারণে গত বছর প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

মেরিটাইম ওয়ার্ল্ডে বাংলাদেশের আরেক নতুন অধ্যায়

মেরিটাইম ওয়ার্ল্ডে আরেকটি নতুন অধ্যায় লিখছে বাংলাদেশ। ইতালির পর এবার চট্টগ্রাম বন্দর থেকে 'মেড ইন বাংলাদেশ'র তৈরি পোশাক নিয়ে সরাসরি যাচ্ছে ইংল্যান্ডের লিভারপুল পোর্টে। ২০শে মে 'এমভি এএমও' নামের জাহাজটি এ রুটের প্রথম জাহাজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে চট্টগ্রাম বন্দরের সিসিটি ১ নম্বর জেটি থেকে। জাহাজটির লোকাল এজেন্ট ফনিক্স শিপিং লিমিটেড। দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরের ইতিহাসে নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা হলো। বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ইংল্যান্ডে কনটেইনার শিপ যাত্রা শুরু করল। এসব কনটেইনারের বেশির ভাগই আরএমজি পণ্য। বাকিগুলোতে পাটজাত পণ্য রয়েছে। ১০০ কনটেইনারে ১৮২ টিইইউ'স নিয়ে 'এমভি এএমও' বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সিসিটি ১ জেটি ছেড়ে গেছে। জাহাজটি বার্থিংয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজটি বন্দর ছেড়ে যায়। আশা করা যায় ২৩ দিনে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে জাহাজটি ইংল্যান্ডের লিভারপুল পোর্টে পৌঁছাবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশে চালু হলো দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ই-গেট

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ই-গেট (স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থা) চালু করেছে বাংলাদেশ। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এটি চালু হয়েছে। একজন যাত্রী মাত্র ১৮ সেকেন্ডে নিজেই নিজের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে পারছেন। ৭ই জুন ই-গেট কার্যক্রমের সময় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মনিরুল ইসলাম এবং ই-পাসপোর্ট ইমিগ্রেশন প্রকল্পের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাদাত হোসাইন। তাদের সামনে ই-গেটের মাধ্যমে যাত্রীর ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম জানান, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোট ১৫টি ই-গেট বসানো হয়েছে। তারমধ্যে বিমানবন্দরের ডিপার্চার (বহির্গমন) এলাকায় ১২টি এবং অ্যারাইভাল (আগমনী) এলাকায় ৩টি ই-গেট বসানো হয়েছে। ৫ ও ৬ই জুন পরীক্ষামূলকভাবে এ গেট ব্যবহার করা হয়েছিল। এতে দেখা গেছে, মাত্র ১৮ সেকেন্ডেই একজন যাত্রী নিজেই নিজের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে পারছেন। এছাড়া শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ছয়টি এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ছয়টি ই-গেট স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর জানায়, ই-পাসপোর্ট নিয়ে যখন একজন ব্যক্তি ই-গেটের কাছে যাবেন, তখন একটি নির্দিষ্ট স্থানে ই-পাসপোর্টটি রাখলে সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে যাবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ৬ই জুন ২০২২ ঢাকায় ক্রীড়া পরিষদ ভবনে 'মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ৫০ ধরনের সেবা অনলাইনে প্রদান উদ্‌যাপন' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

তখন নির্দিষ্ট নিয়মে গেটের নিচে দাঁড়ানোর পর ক্যামেরা ওই ব্যক্তির ছবি তুলে নেবে। এরপর সব ঠিকঠাক থাকলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ইমিগ্রেশন পার হয়ে যেতে পারবেন যাত্রী।

তরুণরা চাকরির ক্ষেত্র তৈরি করবেন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক অনন্য উপহার। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তরুণ-তরুণীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসেই ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে কাজ করে ডলার আয় করবেন। নিজেরা উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের তরুণেরা এখন চাকরি খুঁজবেন না, তারা চাকরির ক্ষেত্র তৈরি করবেন। ৫ই জুন মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার পঞ্চরাস্তা মোড় এলাকায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। উপজেলা সদরে দুর্গা নারায়ণ (ডিএন) পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, তারুণ্যের মেধা ও প্রযুক্তি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের তরুণেরা চাকরি করবেন না, তারা চাকরির ক্ষেত্র তৈরি করবেন। দেশের তরুণদের উদ্যোক্তা ও আত্মনির্ভরশীল করতে ব্রেন চাইল্ড শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, স্কুল অব ফিউচার, ডিজিটাল এডুটেইনমেন্ট সেন্টারসহ দেশে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে প্রযুক্তি খাতে ৩০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। এসময়ের মধ্যেই এ খাত থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার আয় হবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়, পুলিশ স্টেশন, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে অপটিক্যাল ফাইবারের আওতায় আনা হচ্ছে। সারা দেশে ১ লাখ ৭০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অপটিক্যাল ফাইবারের আওতায় আনা হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ মানুষকে ইন্টারনেটের আওতায় আনা হবে।

করোনাকালে ১৬০০ ডিজিটাল বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বিগত দুই বছরে বিশ্বের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি দুই বছরে এক হাজার ৬০০টি ডিজিটাল বৈঠকে উপস্থিত থেকেছেন। মন্ত্রিসভা, একনেক, রাজনৈতিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিলিয়ে এসব বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি। তাঁর দিক নির্দেশনায় করোনা মোকাবিলায় বিশ্বে পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ৭ই জুন জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি খালেদা খানমের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন না করলে করোনাকালে গত দুই বছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাণিজ্যিক কার্যক্রম এমনকি বিচারিক কার্যক্রম চালানো সম্ভব হতো না। ২০১৮ সালে চালু হওয়া '৩৩৩' সেবার মাধ্যমে করোনাকালে শেখ হাসিনার আহ্বানে কর্মহীন, নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

যুদ্ধের মধ্যেও রাশিয়ায় তৈরি পোশাক রপ্তানি হচ্ছে

ইউক্রেনে রুশ হামলার প্রভাব বেশ পড়েছে বিশ্বব্যাপী। তবে যুদ্ধের মধ্যেও তৈরি পোশাক রপ্তানি বন্ধ হয়নি। এমনকি রপ্তানি হওয়া পোশাকের অর্থও পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ায় নিয়মিত পোশাক রপ্তানি হচ্ছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ায় ৪৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়, অর্থাৎ মাসে গড়ে ৬ কোটি ডলারের পোশাক গেছে রাশিয়ায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের দুই মাস মার্চ-এপ্রিলে ৫ কোটি ৭৪ লাখ ডলার বা মাসে গড়ে ২ কোটি ৮৭ লাখ ডলারের পোশাক গেছে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা ও মান উৎকর্ষ পুরস্কার পেল ২৬ শিল্পপ্রতিষ্ঠান

বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প–এ পাঁচ শ্রেণিতে ২০২০ সালের জন্য জাতীয় উৎপাদনশীলতা ও মান উৎকর্ষ পুরস্কার পেয়েছে দেশের ২৬টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। একইসঙ্গে উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ২৯শে মে ২০২২ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২০-এর সনদ ও ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই জুন ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস)-এর সুবর্ণ জয়ন্তী ও সমাবর্তন ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

একটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ২৯শে মে বিজয়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। এসময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার।

২০১২ সাল থেকে দেওয়া এই পুরস্কারের পোশাকি নাম 'ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড'। শিল্পকারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষ অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এই পুরস্কার দিয়ে থাকে। এ নিয়ে সপ্তমবারের মতো পুরস্কার দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১-এর চূড়ান্ত অনুমোদন

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৩১শে মে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১'-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। কারিকুলাম অনুমোদন সংক্রান্ত ৩টি জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) ও একটি উপদেষ্টা কমিটির যৌথ বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন কারিকুলামের নীতিগত অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শিক্ষাকে আনন্দময় করতে ঢেলে সাজানো হচ্ছে পুরো কারিকুলাম। ২০২৩ সাল থেকে প্রাথমিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে এবং মাধ্যমিকে ৬ষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে এ কারিকুলাম চালু হবে। ২০২৪ সালে তৃতীয়, চতুর্থ এবং অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে এ কারিকুলাম চলবে। পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন করা হবে ২০২৫ সালে। ইতোমধ্যে সারা দেশে ৬১টি স্কুল, কারিগরি ও মাদ্রাসায় পাইলটিং শুরু করা হয়েছে। এছাড়া নতুন কারিকুলামে প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরে সপ্তাহে দুইদিন ছুটি নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় দিবসগুলো পালনের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখার নিয়ম রাখা হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দিবসগুলো পালন করতে হবে।

নতুন কারিকুলামে কমলো পরীক্ষা নির্ভরতা

নতুন শিক্ষা কারিকুলামে কমানো হয়েছে পরীক্ষা নির্ভরতা। পরীক্ষা ও মুখস্থনির্ভর পড়াশোনার পরিবর্তে পারদর্শিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বাতিল করা হয়েছে পরীক্ষা। এছাড়া পিইসি, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষা কমিয়ে জোর দেওয়া হয়েছে শ্রেণিকক্ষে শিখনকালীন মূল্যায়নে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে শিখনকালীন মূল্যায়ন করা হবে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন করা হবে ৬০ ভাগ। আর বছর শেষে সামষ্টিক মূল্যায়ন বা পরীক্ষা হবে ৪০ ভাগ। ধর্ম, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শিল্পকলায় কোনো পরীক্ষা হবে না। শ্রেণিকক্ষে শিখনকালীন মূল্যায়ন বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন হবে এসব বিষয়ে। একইভাবে ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণিতেও পরীক্ষা মূল্যায়ন করা হবে। কিন্তু নবম ও দশম শ্রেণিতে বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও গণিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন করা হবে ৫০ ভাগ। সামষ্টিক মূল্যায়ন বা পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন হবে ৫০ ভাগ। বাকি বিষয়গুলোর পরীক্ষা না নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিখনকালীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন হবে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত থাকবে না বিজ্ঞান, মানবিক বা ব্যাবসায় শিক্ষার মতো কোনো বিভাগ বিভাজন। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রতি বর্ষের শেষে আলাদা চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে। একাদশ ও দ্বাদশের ফল সমন্বয় করে দেওয়া হবে এইচএসসি ও সমমান পাবলিক পরীক্ষার ফল। এছাড়া পরীক্ষার মাধ্যমে সামষ্টিক মূল্যায়ন করা হবে ৭০ ভাগ। শ্রেণিকক্ষে শিখন ফলের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে ৩০ ভাগ।

বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৪ঠা জুন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্সবাজার কোস্টাল বায়োডাইভার্সিটি, মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ রিসার্চ সেন্টারে 'মেরিন রিসার্চ হ্যাচারি'র উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো গবেষণা করা। তিনি

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করার আহ্বান জানান। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কাজে লাগিয়ে আগামীতে সুন্দর ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে গড়ে তোলা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

wewb‡qvM: we‡kl cwZ‡e`b

ওরাকলের বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওরাকল করপোরেশন চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করবে। এছাড়া কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সিস্টেম এবং এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার পণ্যতে পারদর্শী এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের মাটিতে স্থাপন করতে যাচ্ছে ওরাকল একাডেমি। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ই-গভর্নমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য জি-ক্লাউড স্থাপনে ৪ টায়ার ডেটা সেন্টারে বিনিয়োগ করেছে। আইসিটি বিভাগের সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বে বাংলাদেশ আয়োজন করবে জাতীয় পর্যায়ের হ্যাকাথন।

সিঙ্গাপুরে অবস্থিত ওরাকল অফিসে ২০শে মে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এ আগ্রহের কথা জানান প্রতিষ্ঠানটির জাপান ও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট গ্যারেট। বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে ছিলেন স্টার্ট-আপ বাংলাদেশ লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদ, ওরাকল ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের সিনিয়র সেলস ডিরেক্টর অ্যানি টিও এবং ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম ব্যাবসার কান্ট্রি ডিরেক্টর আরশাদ ও ওরাকলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ

বাংলাদেশের জন্য স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট (এসইএআর) প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। ২৪শে মে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে সংস্থাটির এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ইকনোমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন (ইউএনইএসসিএপি) এবং হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ যৌথ অংশীদারিত্বে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও নির্বাহী সেক্রেটারি আরমিদা সালসিয়াহ আলিসজাহবানা।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি, বর্তমান পরিস্থিতি এবং দেশে স্টার্ট-আপ সংস্কৃতিবান্ধব নীতি ও বাংলাদেশের ডিজিটাল ভবিষ্যতের সুগভীর বিশ্লেষণ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিবেদনে গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের স্টার্ট-আপগুলোর ৪৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ প্রাপ্তিকে স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে জেন্ডার লেন্স ইনভেস্টমেন্ট (জিএলআই) সম্পর্কে একটি বিশেষ অনুসন্ধানও রয়েছে। নারী স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠাতা এবং উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জের ওপর আলোকপাত করার অপরিহার্যতা তুলে ধরে তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি এবং ব্যাবসায়িক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীতে সরকারের প্রাসঙ্গিক স্টার্ট-আপ নীতি প্রণয়নের সময় এই প্রতিবেদনটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নকে অবিস্মরণীয় উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির অসাধারণ সাফল্যের পর এবার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নিজেদের মানিয়ে নিতে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশে একটি প্রাণবন্ত স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা হচ্ছে। আশা করছি, ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ আয়ের সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়িত হবে।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বান্দরবানের নেতৃত্ব নারীদের হাতে

বান্দরবান এগিয়ে যাচ্ছে নারীদের হাত ধরে। বান্দরবান জেলার প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়ন– সব কাজই চলছে নারীদের নেতৃত্বে। জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, নির্বাহী প্রকৌশলী, তিনটি উপজেলায় নির্বাহী কর্মকর্তাসহ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে বান্দরবান প্রশাসনের শীর্ষ পদে এখন ডজন খানেক নারী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন।

বান্দরবান জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে (বাঁ থেকে) আলীকদমের ইউএনও মেহরুবা ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুরাইয়া আক্তার, জেলা প্রশাসক ইয়াসমিন পারভীন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে কুলসুম ও সদর ইউএনও সাবরিনা আফরিন

২০২০ সালে বান্দরবানের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে আসেন পুলিশ সুপার (এসপি) জেরিন আখতার। জেলার সাতটি উপজেলার পুলিশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। ২০২১ সালে জেলা প্রশাসন প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে আসেন ইয়াছমিন পারভীন। অত্যন্ত সফলতার সাথে দেড় বছর ধরে এ দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এছাড়াও বান্দরবানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আছেন উম্মে কুলসুম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হিসেবে আছেন সুরাইয়া আক্তার। আছেন নাইক্ষ্যংছড়ির ইউএনও সালমা ফেরদৌস ও আলীকদমের ইউএনও মেহরুবা ইসলাম। বান্দরবান সদর উপজেলার ইউএনও হিসেবে ছিলেন সাবরিনা আফরিন। তিনি বদলি হওয়ায় সম্প্রতি তার জায়গায় এসেছেন সাজিয়া আফরোজ।

প্রশাসনের বাইরে বান্দরবানে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আছেন শর্মিষ্ঠা আচার্য ও গণপূর্ণ বিভাগে আছেন শর্মী চাকমা। সদর উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে আছেন ভানু মারমা। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আতিয়া চৌধুরী, পল্লি উন্নয়ন বোর্ডের উপপরিচালক সুইক্রাচিং মারমা দায়িত্ব পালন করছেন নিষ্ঠার সাথে।

নিম্যান ফেলোশিপ পেয়েছেন বাংলাদেশের সাবিহা আলম

সাংবাদিকদের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ নিম্যান ফেলোশিপ পেয়েছেন বাংলাদেশের *প্রথম আলো* পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদক শেখ সাবিহা আলম। ১১ই মে এবারের নিম্যান ফেলোদের নাম ঘোষণা করে নিম্যান ফাউন্ডেশন। নিম্যান ফাউন্ডেশন ফর জার্নালিজমে এবার বিভিন্ন দেশের ২৪ জন সাংবাদিক সুযোগ পেয়েছেন।

নিম্যান ফাউন্ডেশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এবারের ফেলোরা সাংবাদিকতায় ভুল তথ্য নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করবেন। এই ফেলোশিপের আওতায় ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবেন তারা। বাংলাদেশের শেখ সাবিহা আলম 'মানবাধিকার লঙ্ঘন ও জোরপূর্বক অভিবাসন' বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক, গবেষক ও লেখকদের সঙ্গে সভা-সেমিনারে অংশ নেওয়ারও সুযোগ পাবেন। সাবিহা আলম ১২ বছর *প্রথম আলোতে* সাংবাদিকতা করেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৩৮ সাল থেকে সাংবাদিকতার জন্য নিম্যান ফাউন্ডেশন এ ফেলোশিপ দিয়ে আসছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

এক কোটি পরিবারকে তেল দেবে টিসিবি

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) ১১০ টাকা লিটারে সয়াবিন তেল বিক্রয় অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এই কার্যক্রম সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে জুন মাস থেকে এক কোটি কার্ডধারী পরিবারের কাছে এই একই দামে তেল বিক্রয় করবে। ৭ই মে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আমরা এক কোটি কার্ডধারী পরিবারের কাছে একই দামে সয়াবিন তেল বিক্রয় করব। সরকার টিসিবির মাধ্যমে সরাসরি সয়াবিন তেল আমদানি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোর সঙ্গে ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সয়াবিন তেল ক্রয় করার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ভেজিটেবল ওয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনসপতি ম্যানুফ্যাকসার্স অ্যাসোসিয়েশন গত ৫ই মে সয়াবিন তেলের দাম লিটারপ্রতি ৩৮ টাকা করে বাড়িয়ে ১৯৮ টাকা পুনঃনির্ধারণ করে। একই সময়ে খোলা সয়াবিন তেলের দাম লিটারপ্রতি ৪৪ টাকা বাড়িয়ে ১৮০ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে ইরি

লবণ, খরাসহ বিভিন্ন ঘাতসহনশীল (স্ট্রেস টলারেন্ট) ধানের জাত উদ্ভাবন ও গবেষণায় বাংলাদেশকে আরও বেশি করে সহযোগিতা করবে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি)। এছাড়া ভারতের বারানসিতে অবস্থিত ইরি দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক অফিসে স্থাপিত বিশ্বমানের গবেষণাগারে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা দ্রুত ধানের জাত উদ্ভাবনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। ১০ই মে সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের সাথে বৈঠকে ইরির এশিয়া প্রতিনিধি নাফিস মিয়া এসব কথা জানান।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে লবণ, খরাসহ বিভিন্ন ঘাতসহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের বিজ্ঞানীরা উন্নতমানের অনেকগুলো জাত উদ্ভাবন করেছে। তারপরও আরও জাত দরকার। এ বিষয়ে সরকার ইরির সহযোগিতা চায়। ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ধান সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করা হবে বলে জানান ইরির এশিয়া প্রতিনিধি নাফিস মিয়া। পরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বড়ো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে দেশে খাদ্য সংকট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই মুহূর্তে মাঠে ধানের অবস্থা ভালো। এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ৯০ হাজার হেক্টর বেশি জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। হাওরে ৪ লাখ ৫২ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে আগাম বন্যায় প্রায় সাত হাজার হেক্টর জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সময়মতো বাঁধ রক্ষা, অনুকূল আবহাওয়া ও যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে ধান কাটার ফলে ইতোমধ্যে হাওরের ধান ঘরে তোলা গেছে।

আধুনিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সনাতন কৃষি

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কৃষিতে এখন সরকারের মূল লক্ষ্য হলো কৃষিকে বাণিজ্যিক ও আধুনিক করা। সেজন্য কৃষির রূপান্তরে সরকার কাজ করছে। যান্ত্রিকীকরণে বিশাল ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এগ্রো-প্রসেসিং, ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল কৃষিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে সনাতন কৃষি আধুনিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ২৬শে মে ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান–২১০০ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে 'কৃষির রূপান্তর' শীর্ষক সেশনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃষিবান্ধব উদ্যোগের ফলে বিগত ১৩ বছরে দেশের কৃষিতে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যে দেশটি একসময় খাদ্য ঘাটতির দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত ছিল, তা আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। করোনা ও যুদ্ধসহ বর্তমান কঠিন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়নি। দেশে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করতে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনা, খরা, লবণাক্ততাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকায় ফসলের চাষ, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, বেশি উৎপাদনশীল জাতের উদ্ভাবন ও চাষ, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল কৃষির জন্য কাজ করছি।

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস এগ্রি-বিজনেস সম্মেলন

কৃষি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে ৩০শে মে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস এগ্রি-বিজনেস কনক্লেভ বা সম্মেলন। বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়, নেদারল্যান্ডসের বাংলাদেশ দূতাবাস, নেদারল্যান্ডসের এগ্রিকালচার, নেচার অ্যান্ড ফুড কোয়ালিটি মিনিস্ট্রি এবং ওয়েজনিনজেন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড রিসার্চ যৌথভাবে দিনব্যাপী

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ২৬শে মে ২০২২ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান–২১০০ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে 'কৃষির রূপান্তর' শীর্ষক সেশনে বক্তব্য দেন

এ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, হর্টিকালচার, ডেইরি, ফিশারিজ ও পোল্ট্রি খাতে উদ্ভাবন ও সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। এসব খাতে ডাচ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও ইনোভেশনকে কীভাবে বাংলাদেশে কাজে লাগান যায়, তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এসময় দুদেশের এগ্রি-বিজনেসের সাথে জড়িত ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কৃষিসচিব মো. সায়েদুল ইসলাম বাংলাদেশের কৃষিতে অর্জিত সাফল্য ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে কৃষি উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এখন খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই ও কৃষিকে লাভজনক করতে কাজ চলছে। এক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডসের অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে আমরা বাংলাদেশে কাজে লাগাতে চাই। এসময় উপকূল, হাওর ও বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপন, ফসলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতা কামনা করেন কৃষিসচিব। নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানির বাধা দূর করতে নেদারল্যান্ডসের অ্যাগ্রোফুড ব্যবসায়ীরা কাজ করবে বলে বৈঠকে জানান। এছাড়া বীজ উৎপাদন ও পরিবহণে এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতে দুদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে বলেও জানানো হয়।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান

১৮ই মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'দক্ষিণ এশিয়া জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তা' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্‌বোধনী অধিবেশনে বঙ্গভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, কার্বন নিঃসরণ কমাতে প্রতিটি জাতিরই একটি ভূমিকা রয়েছে। উন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় পর্যাপ্ত অতিরিক্ত সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং খাদ্য নিরাপত্তা একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাব কমাতে কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং সেগুলো এখনই প্রয়োজন। এটাকে বৈশ্বিক সমস্যা দাবি করে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমি আশা করি যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে ঐতিহাসিকভাবে উচ্চ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণকারী বহুজাতিক সংস্থা উন্নয়ন অংশীদার, বিজ্ঞানী, মিডিয়া, নীতি নির্ধারক এবং সুশীল সমাজ এই ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা প্রদানের জন্য এগিয়ে আসবে।

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস

জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি ২২শে মে দিনটি বিশ্ব জীববৈচিত্র্য দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে আসছে। উজার রোধ করে জীববৈচিত্র্য রক্ষার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে এ বছর পালিত হয় আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস।

১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন পাস করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ১৯৯২ সালের ২২শে মে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে বায়োডাইভার্সিটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এরপর ৫ই জুন ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির ধরিত্রী সম্মেলনে সিবিডি বিভিন্ন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই জুন ঢাকায় গণভবনে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২' এবং 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২২'-এর উদ্‌বোধন উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ করেন –পিআইডি

দেশের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ১৬৮ দেশ সিবিডি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। বর্তমানে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ১৯৫টি।

পরিবেশ রক্ষায় প্রকল্প বাস্তবায়ন

যে-কোনো উন্নয়ন প্রকল্প যেন পরিবেশ রক্ষা করে গ্রহণ করা হয় তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৫শে মে গণভবনে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের নকশা পর্যবেক্ষণকালে তিনি এ নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী 'গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়' এবং 'রাজউক' কর্তৃক প্রস্তাবিত ঢাকার শেরে-বাংলা নগরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ, পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তের শিবচরে 'শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ', 'কনজারভেশন অব ফ্লাড ফ্লো জোন অ্যাট তুরাগ রিভার অ্যান্ড কম্প্যাক্ট টাউনশিপ ডেভেলপমেন্ট' এবং 'কেরানীগঞ্জ ওয়াটার ফ্রন্ট স্মার্ট সিটি নির্মাণ' প্রকল্পগুলোর স্থাপত্য নকশার উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেন। পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে-কোনো প্রকল্প গ্রহণ করে সেখানে পরিবেশটা যেন গুরুত্ব পায় সেদিকে সবার দৃষ্টি দিতে হবে। জলাধার সংরক্ষণ, পর্যাপ্ত সবুজ এলাকা রাখা ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

যত্রতত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যেকটি এলাকায় নির্দিষ্ট শিল্প জোনে হবে। যেখানে-সেখানে অপরিকল্পিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যাবে না, এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অ্যাগ্রো প্রসেসিং এবং আইটি ডিভাইস সংক্রান্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। প্রধানমন্ত্রী রপ্তানি বাড়ানোর ওপরও গুরুতারোপ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ছোটো ছোটো ইন্ডাস্ট্রিকে ভরতুকি দেওয়ার কথাও বলেন।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ব্রণ, মেছতা, শ্বেতীর সফল চিকিৎসা এখন দেশেই

দেশে এখন চর্মরোগের সফল ও আধুনিক চিকিৎসা হচ্ছে। ত্বকের জটিল রোগ ছাড়াও মুখের ক্ষত, ব্রণ, মেছতার দাগ, টাক মাথায় চুল গজানো, শ্বেতীরোগ, ভ্রু-ঠোঁটের সৌন্দর্যবর্ধন, আঁচিল, ট্যাটু দূর করা ইত্যাদির আধুনিক চিকিৎসা এখন দেশেই হচ্ছে। দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু করা হলে সফলতা আসে বেশি। ২৪শে মে চর্ম ও যৌনরোগ বিষয়ে সোসাইটি অব ডার্মাটোলজিক সার্জনস অব বাংলাদেশ (এসডিএসবি) আয়োজিত নবম আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং সংস্থার দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা।

অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা বলেন, দেশে দেড় দশকে চর্মরোগের চিকিৎসায় ব্যাপক বিস্তৃতি হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে ত্বকের বিভিন্ন ধরনের দাগ, ক্ষত, ব্রণ, তিল অপসারণ, চুল পড়া বন্ধ, টাক মাথায় চুল গজানো, জন্মদাগ ঢেকে দেওয়া ইত্যাদি সৌন্দর্য বাড়ানোর প্রয়োজনীয় চিকিৎসার দিকেও ঝুঁকছে মানুষ। ত্বকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শ্বেতীরোগের চিকিৎসা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সফলতার হার ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার ২৬শে মে ২০২২ ঢাকায় ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে 'বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস ২০২২'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ-জনসচেতনতা এবং বাহক নির্ণয় কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন –পিআইডি

ইনসুলিনের কার্টিজ তৈরি হবে দেশেই

ইনসুলিনের কার্টিজ 'পেনফিল' এখন দেশেই তৈরি হতে যাচ্ছে। দেশের ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এসকেএফ ডেনমার্কের ইনসুলিন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নভো নরডিস্কের সাথে যৌথভাবে এ কার্টিজ তৈরি করবে। ২৪শে মে এসকেএফের টঙ্গী ওষুধ কারখানা প্রাঙ্গণে পৃথক একটি ভবনে ইনসুলিনের কার্টিজ তৈরির ইউনিট উদ্‌বোধন করা হয়। বাংলাদেশে ইনসুলিনের কার্টিজ তৈরির উদ্যোগ ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান দুটির কর্মকর্তারা বলেন, ইনসুলিনের কার্টিজ বিদেশ থেকে আমদানি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাজারজাত করে। এসকেএফের কারখানায় উৎপাদন শুরু হলে তা হবে দেশে উৎপাদিত প্রথম আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ইনসুলিন কার্টিজ। এটি প্রযুক্তি হস্তান্তর বা টেকনোলজি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রেও বড়ো ঘটনা। এর ফলে দেশের ডায়াবেটিস রোগীদের কাছে ইনসুলিন সহজলভ্য হবে।

মাঙ্কিপক্স নিয়ে সতর্কতা জারি

বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়া মাঙ্কিপক্স নিয়ে দেশের আন্তর্জাতিক বিমান, সমুদ্র ও স্থলবন্দরগুলোতে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সতর্কতার অংশ হিসেবে আক্রান্ত দেশ থেকে আসা যাত্রীদের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখাসহ স্ক্রিনিং জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২২শে মে এ সতর্কতা জারি করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাঙ্কিপক্স নতুন কোনো রোগ নয়। যেসব রোগীর ফুসকুড়ি দেখা যাবে, যারা সম্প্রতি মাঙ্কিপক্স ছড়িয়ে পড়া দেশে ভ্রমণ করেছেন অথবা এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, যাদের একই রকম ফুসকুড়ি দেখা দিয়েছে কিংবা যারা নিশ্চিত অথবা সন্দেহজনক মাঙ্কিপক্স রোগী হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন, তাদের সন্দেহজনক রোগীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদের আইসোলেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা ও রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে (আইইডিসিআর) তথ্য জানাতে হবে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

wbivc` moK : we‡kl cwZ‡e`b

যানজট সমাধানে স্কুলগুলোর নিজস্ব বাস সার্ভিস

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, ঢাকায় স্কুল টাইমে প্রাইভেট স্কুলের এক একটি শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা প্রাইভেটকার নামে রাস্তায়। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি এই সমস্যা সমাধানে স্কুলগুলোকে নিজস্ব বাস সার্ভিস চালু করতে বাধ্য করার জন্য। ১৪ই মে রাজধানীর গুলশান-২-এ নগর ভবন প্রধান কার্যালয়ে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের দুই বছর পূর্তিতে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। মেয়র বলেন, যানজট নিরসনে শহরের প্রতিটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের আসা-যাওয়ার জন্য স্কুল বাসের ব্যবস্থা করার বিষয়ে পরিকল্পনা নিয়েছি। এর ফলে যানজট অনেকাংশেই কমে আসবে। কারণ তখন এত বেশি সংখ্যক প্রাইভেটকার স্কুলে শিক্ষার্থী নেওয়ার জন্য আর বের হবে না।

দ্রুত আট লেনের নির্মাণকাজ চলছে

রাজধানীর যানজট নিরসনে তৈরি করা ঢাকা বাইপাস সড়কের আট লেনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে (পিপিপি) নির্মাণাধীন গাজীপুরের ভোগরা থেকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলা হয়ে সোনারগাঁওয়ের মদনপুর পর্যন্ত ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এ ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে এক হাজার ৭৫ কোটি ঋণ সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল)।

নারায়ণগঞ্জ সড়ক ও জনপদ বিভাগের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সিচুয়ান রোড অ্যান্ড ব্রিজ গ্রুপ করপোরেশন লিমিটেড (এসআরবিজি) এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান শামীম এন্টারপ্রাইজ ও ইউডিসি কনস্ট্রাকশন লিমিটেডকে নিয়ে যৌথভাবে ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। এটি গাজীপুরের ভোগরা থেকে নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে পর্যন্ত পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে প্রায় ৩ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা বাইপাস নির্মাণ হচ্ছে। যা আট লেনের সড়ক হবে।

এদিকে সওজ সূত্র জানায়, প্রকল্পের আওতায় মদনপুর থেকে কড্ডা পর্যন্ত মূল এক্সপ্রেস সড়ক হবে চার লেনের। এর বাইরে সড়কের দুই পাশে থাকবে আরও দুটি লেন। এগুলোর প্রশস্ততা হবে দেড় লেন করে। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরের ভোগরা, মিরেরবাজার, বস্তুল, ধীরাশ্রম ও কাঞ্চন সেতুর আগে নির্মাণ করা হবে পাঁচটি ফ্লাইওভার, ২৫টি আন্ডারপাস। যেহেতু সড়কের একটা বড়ো অংশ যাবে পূর্বাঞ্চলের ওপর দিয়ে, সে কারণে আন্ডারপাসকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

ফেনীর লালপোলে ফ্লাইওভার নির্মাণ

জেলার দক্ষিণাঞ্চলে যাতায়াতে দুর্ভোগ ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিরসনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর লালপোলে ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ফেনী সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী বিনয় কুমার পাল। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, ন্যূনতম ছয় লেন বিশিষ্ট এ ফ্লাইওভারটির দৈর্ঘ্য হবে ৬০০ মিটার। ঢাকা-চট্টগ্রামগামী যানবাহনগুলো সরাসরি ফ্লাইওভার ব্যবহার করে যাতায়াত করবে। ফেনী-সোনাগাজীতে চলাচলকারী পরিবহণগুলো ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে মহাসড়ক পারাপার করবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

we`¨vr : we‡kl cwZ‡e`b

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহই লক্ষ্য

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সরবরাহের লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে বলে জানান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। ২৫শে মে মন্ত্রণালয়ে সমন্বিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মহাপরিকল্পনার সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে জাইকার স্টাডি টিমের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় জাইকার বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

ও জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা তোশিয়ুকি কোবেয়াশ ও জাইকার বাংলাদেশের প্রতিনিধি তারো কাৎসুরাই উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাশ্রয়ী মূল্যে আমরা গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ করতে চাই। এলক্ষ্যে জ্বালানির একাধিক বিকল্প উৎস থাকা প্রয়োজন। বৈচিত্র্যময় জ্বালানি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিয়েও আমরা কাজ করছি উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল এবং টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন গবেষণা ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান দুটি জাইকার সঙ্গে কাজ করলে আরও বাস্তবসম্মত ফল পাওয়া যাবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনায় পরিবেশবান্ধব জ্বালানির প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। খসড়া এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে ভবিষ্যতে কার্বন নিঃসরণের নেট শূন্য দৃশ্যকল্প পরিষ্কার হবে। মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ পরিষ্কার জ্বালানির রূপান্তরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ৭৮৮.১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুতের মধ্যে ৫৫৪.১৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সোলার থেকে আসে। ২০২৫ সালের মধ্যে ২৮টি নির্মাণাধীন সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আরও প্রায় ১৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে ১২ শতাংশ জনগণকে ৬.০২ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদনঃ রিপা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ-ভারত ট্রেন চালু

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে প্রায় দুই বছর বন্ধ থাকার পর আবারো চালু হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল। এ রুটের যাত্রীবাহী ট্রেন তিনটি ১লা জুন থেকে আবারো চলাচল করবে। ১৭ই মে বার্তা সংস্থা টিএনএনের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে *টাইমস অব ইন্ডিয়া*। সূত্রের বরাতে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমটি জানিয়েছে, আগামী মাসে বাংলাদেশ সফরে আসছেন ভারতের কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তার ওই সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী এক্সপ্রেস, বন্ধন এক্সপ্রেস ও নিউ জলপাইগুড়ি-ঢাকা মিতালী এক্সপ্রেস চলাচল আবার শুরু হবে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের মার্চে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ি রুটের ট্রেনটি উদ্‌বোধন করেছিলেন।

বাংলাদেশিদের কাছে মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেস বেশ জনপ্রিয়। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ভারতে চিকিৎসা করাতে যান লাখ লাখ মানুষ। শারীরিক জটিলতার কারণে অনেকের প্লেনে চড়ায় নিষেধাজ্ঞা থাকে, অনেকের আকাশপথে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে না। আবার সড়কপথে যাওয়ার ধকলও নিতে পারেন না অনেকে। এ পরিস্থিতিতে তাদের একমাত্র ভরসা দুদেশের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনগুলো। পদ্মা সেতু চালু হয়ে গেলে ঢাকা থেকে কলকাতা যেতে সময় লাগবে মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা।

নতুন ৪৬ রেলইঞ্জিন উদ্‌বোধন

জাতীয় পতাকা তুলে ও বাঁশি বাজিয়ে নতুন ৩০টি মিটারগেজ ও ১৬টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভের (ইঞ্জিন) উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৭শে এপ্রিল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা এসব রেলইঞ্জিন উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় তিনি বলেন, কিছুদিন পরই ঈদ । ঈদে দেশের জনগণের চলাচল আরও বাড়বে । সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আজকে যে নতুন লোকোমোটিভ চালু হচ্ছে, তাতে আমাদের দেশের মানুষ আরও ভালোভাবে ঈদের উৎসবে যোগ দিতে পারবে। নিজের আপন ঘরে ফিরতে পারবে। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী মো. নুরুল ইসলাম সুজন ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

প্রতিবেদনঃ জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

৪৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ

৪৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। প্রকাশিত ফলে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৫ হাজার ৭০৮ জন। ২২শে জুন পিএসসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের বিশেষ সভায় এ ফলাফল অনুমোদন করা হয়। এরপর পিএসসি থেকে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানা যাবে। এছাড়া এসএমএসের মাধ্যমে টেলিটক মোবাইল থেকে PSC লিখে স্পেস দিয়ে ৪৪ লিখে স্পেস দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে ফিরতি এসএমএসে ফলাফল জানা যাবে।

২৭শে মে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে ৪৪তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ২০০ নম্বরের এ পরীক্ষা হয়। ৪৪তম বিসিএসে মোট আবেদন করেন ৩ লাখ ৫০ হাজার ৭১৬ জন।

সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৮৭৫ জন প্রার্থীকে এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ২৮শে জুন বাংলাদেশ পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করার পর এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে প্রার্থীদের জানানো হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখে কোনো প্রার্থী অনুপস্থিত থাকলে তিনি চাকরি করতে অনিচ্ছুক বলে গণ্য হবেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য এবং পুলিশ ভেরিফিকেশনে সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) হিসেবে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদায় পাঠানো হবে। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। শিক্ষানবিশ ঘোষণার তারিখ থেকে দুই বছর চাকরিকাল সফলভাবে সম্পন্নের পর চাকরি স্থায়ী করা হবে। উন্নত বাংলাদেশের উপযোগী করে পুলিশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবার এসআই পদে নতুন নিয়মে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসআই নিয়োগে এবারই প্রথমবারের মতো কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষা নেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সারা দেশে বর্ণিল নজরুল জয়ন্তী

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সারা দেশে ২৫শে মে, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী। এবারের নজরুল জয়ন্তীর রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কুমিল্লায়। অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য–'বিদ্রোহীদের শতবর্ষ'। এছাড়া ঢাকা, ময়মনসিংহের ত্রিশাল, কুমিল্লার দৌলতপুর, মানিকগঞ্জের তেওতা, চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গা ও চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে নজরুল মেলা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন কবির সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ ও কবি ভক্তরা। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হয়ে উপাচার্য প্রফেসর মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ফুল দিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও ফাতেহা পাঠ করেন।

ভারতে আলমগীর-রুনা লায়লা দম্পতির আজীবন সম্মাননা

অভিনেতা আলমগীর ও সংগীত শিল্পী রুনা লায়লা দম্পতি ভারতে একসঙ্গে একই মঞ্চে আজীবন সম্মাননা পেলেন। ১৪ই মে কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'টেলিসিনে অ্যাওয়ার্ড'-এর ১৯তম আসর। জমকালো এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত করা হয় আলমগীর-রুনা লায়লাকে।

কলকাতার বড়ো ও ছোটো পর্দার বিভিন্ন শাখায় অবদানের জন্য শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে টেলিসিনে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। এই আয়োজনে কলকাতার পাশাপাশি বাংলাদেশি শিল্পীদেরও পুরস্কার দেওয়া হয়। করোনার কারণে গত তিন বছর এ অনুষ্ঠান বন্ধ থাকায় এ বছর ১৪ই মে শেষ তিন বছরের জন্য কলকাতা ও ঢাকার শিল্পীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। আলমগীর-রুনা লায়লা দম্পতি ছাড়াও এই আসরে মমতাজ, কোনাল ও তাসনিম আনিকা পেয়েছেন সেরা গায়িকার পুরস্কার। সেরা অভিনেতা আরিফিন শুভ আর সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন আজমেরী হক বাঁধন।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস

১৮ই মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব মিউজিয়ামের আহ্বানে ১৯৭৭ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়। ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আইসিওএম। এর সদস্য হিসেবে বর্তমানে ১০৭টি দেশের ২৮ হাজার জাদুঘর যুক্ত রয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'পাওয়ার অব মিউজিয়াম'। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বর্ণাঢ্য র‍্যালি, বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। জাতীয় জাদুঘরের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে শাহবাগস্থ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবুল মনসুর।

প্রতিবেদনঃ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

কান উৎসবে gyRe: GKwU RwZi i|cKvi বায়োপিকের ট্রেইলার উদ্‌বোধন

কান চলচ্চিত্র উৎসবে *মুজিব: একটি জাতির রূপকার* (Mujib: The Making of a Nation) চলচ্চিত্রটির ট্রেইলার উদ্‌বোধন করা হয়। এ উৎসব ১৭ই মে থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত চলে। ফ্রান্সে কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭৫তম আসরের তৃতীয় দিন ১৯শে মে ভারতীয় প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এই বায়োপিকের ট্রেইলার উদ্‌বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এবং ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, মুজিব চলচ্চিত্রটিতে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, জাতির জন্য সংগ্রাম থেকে বিজয় ও পরম আত্মত্যাগের চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমা বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে যুগে যুগে জাগ্রত রাখবে এবং মানবতার জন্য আত্মনিবেদনের প্রেরণা জোগাবে। তিনি এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা, ভারত সরকার, সিনেমাটির নির্মাতা, পরিচালক, শিল্পী-কলাকুশলীসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র weDwU mvKvm

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাহমুদ দিদারের চলচ্চিত্র *বিউটি সার্কাস*। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রটিতে প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হয় ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। এ সিনেমার গল্প গড়ে উঠেছে সার্কাসের মালিক ও প্রধান নারী শিল্পী বিউটি ও তার সার্কাস দলটি নিয়ে। বিউটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান। তার জাদু প্রদর্শনী আর রূপে পাগল এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। বিউটিকে নিজের করে পাবার প্রতিযোগিতায় নামে তারা। একসময় হুমকির মুখে পড়ে বিউটির সার্কাস। এ চলচ্চিত্রে আরও অভিনয় করেছেন ফেরদৌস, তৌকির আহমেদ, গাজী রাকায়েত, এবিএম সুমন, শতাব্দী ওয়াদুদ, হুমায়ূন কবীর সাধুসহ অনেকে।

চলচ্চিত্র Zvjvk-এর ট্রেইলার প্রকাশ

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ইয়াসমিন বুবলী ও নবাগত চিত্রনায়ক আদর আজাদ অভিনীত প্রথম সিনেমা *তালাশ*। ১৭ই জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। রোমান্টিক থ্রিলার ধাঁচের গল্পে নির্মিত এ সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সৈকত নাসির। ১৯শে মে টাইগার মিডিয়ার ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পেয়েছে অ্যাকশন-রোমান্সে ভরা তিন মিনিটের সিনেমাটির ট্রেইলার। ক্লিওপেট্রা ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত সিনেমাটির কাহিনি পরিচালকের সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছেন আসাদ জামান। এ সিনেমাটিতে পাঁচটি গান রয়েছে। সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন আসিফ আহসান খান, মাসুম বাশার, মিলি বাশার, যোজন মাহমুদ প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে নতুন সিনেমা হল

সিনেমাপ্রেমীদের জন্য আরেকটি আনন্দ সংবাদ নিয়ে এল স্টার সিনেপ্লেক্স। রাজধানীর বিজয় সরণিতে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে চালু হচ্ছে জনপ্রিয় এই মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হলের নতুন শাখা। এটি স্টার সিনেপ্লেক্সের পঞ্চম শাখা। একটি হল থাকছে এখানে। আসন সংখ্যা ১৮৩। বরাবরের মতো মনোরম পরিবেশ, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্বলিত সাউন্ড সিস্টেম, জায়ান্ট স্ক্রিনসহ বিশ্বমানের সিনেমা হলের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থাকছে এই সিনেপ্লেক্সে। ২০০৪ সালে রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে যাত্রা শুরু করে দেশের প্রথম মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল 'স্টার সিনেপ্লেক্স'। বর্তমানে ঢাকায় ৪টি শাখা রয়েছে এর। ধানমন্ডির সীমান্ত সম্ভার (সাবেক রাইফেলস স্কয়ার), মহাখালীর এসকেএস

(সেনা কল্যাণ সংস্থা) টাওয়ার এবং মিরপুর-১ নম্বরের সনি স্কয়ারে একটি শাখা রয়েছে। এছাড়া ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম এবং বগুড়ায় আরও দুইটি শাখার নির্মাণকাজ চলছে, যা চলতি বছরই উদ্‌বোধন হওয়ার কথা রয়েছে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

পরোক্ষ ধূমপানও অধূমপায়ীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তামাক সেবন তথা ধূমপান, জর্দা ও গুলের ব্যবহার প্রাণঘাতী নেশা। এছাড়া পরোক্ষ ধূমপানও অধূমপায়ীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ৩১শে মে 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর বাংলাদেশে দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ'।

গবেষণায় জানা গেছে, তামাক সেবনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ যেমন: হৃদরোগ, ক্যানসার, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে বছরে ৮০ লক্ষাধিক ও বাংলাদেশে ১ লাখ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাক ব্যবহারকে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ট্যোবাকো কন্ট্রোল' (এফসিটিসি) প্রণয়ন করেছে। এফসিটিসির আলোকে ২০১৩ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'-এর সংশোধন করা হয়েছে। জাতিসংঘ তামাককে উন্নয়নের হুমকি বিবেচনায় নিয়ে এফসিটিসির কার্যকর বাস্তবায়ন ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (এসডিজি) প্রণয়ন করেছে। বর্তমান সরকার এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুক্ত করেছে। সে লক্ষ্যে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাদক রোধে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত বিজিবি

মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন ও সর্বজনীন প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ। সীমান্তে মাদক পাচার রোধে বিজিবি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। ২৭শে মে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কক্সবাজার রিজিয়নের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য ধ্বংসকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্রিস্টাল মেথ আইস ও ইয়াবা ধ্বংস করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। কক্সবাজার রিজিয়নের বিজিবি সদস্যরা মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করায় অনুষ্ঠানে তাদের প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অনুষ্ঠানের শুরুতে মাদকের বিরুদ্ধে বিজিবির অভিযানিক কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। পরে বিজিবির কক্সবাজার রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজম-উস-সাকিব স্বাগত বক্তব্য দেন।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

২৫১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণ

দীঘিনালায় দুর্গম এলাকায় বসবাসরত নৃগোষ্ঠী জনগণের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণ করা হয়েছে। ৩০শে মে উপজেলার বোয়ালখালী ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে ২৫১টি পরিবারের মাঝে

সোলার প্যানেল বিতরণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প-২য় পর্যায় শীর্ষক' বাস্তবায়ন করা হয়।

পার্বত্যাঞ্চল সেরা অঞ্চলে পরিণত হবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, আমরা যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করি তাহলে পার্বত্যাঞ্চল দেশের সেরা অঞ্চলে পরিণত হবে। ২৫শে মে রাঙামাটি জেলা পরিষদের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জেলা পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

পার্বত্য মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে। নানিয়ারচর উপজেলায় মিনি পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে। দুর্গম পাহাড়ে বসবাসরত বাসিন্দাদের বিদ্যুতের সেবা পৌঁছে দিতে বিনা পয়সায় ৫০ হাজার সোলার বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মসজিদ-মন্দির-গির্জার উন্নয়ন, জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদ সবই আজ চুক্তির ফসল।

মন্ত্রী আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিশেষ মন্ত্রণালয় তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আমরা আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কাজ করছি। চুক্তি বাস্তবায়ন হবে; প্রধানমন্ত্রী যা কথা দেন তাই করেন। ২০৪১ এবং ২১০০ সালে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ অঞ্চলের সন্তানরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, জেলা পরিষদ সকল প্রকল্পগুলোকে এই অর্থবছরে দ্রুত বাস্তবায়ন করবে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারে চারা ও বীজ বিতরণ

দীঘিনালায় বসতবাড়ির আঙিনায় পুষ্টি বাগান সৃজনের জন্য চারা, বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ে এ বীজ, চারা ও সার বিতরণ করা হয়। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বসতবাড়ির আঙিনায় পুষ্টি বাগান সৃজনের জন্য কৃষি বিভাগ থেকে বীজ, চারা ও সার

দেওয়া হয়। ২৪শে মে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার এসব বীজ, চারা ও সার গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে দীঘিনালা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী জানান, বসতবাড়ির আঙিনায় পুষ্টি বাগান সৃজনের জন্য কৃষি বিভাগ থেকে দুটি করে পেঁপে, লেবু এবং পেয়ারা চারা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৫০ কেজি জৈব সার এবং একটি পানি ছিটানোর ঝরনা প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

wkï I wK‡kvi Dbqb : we‡kl cwZ‡e`b

মুক্তিযুদ্ধ কুইজ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত ৫০ জন শিশু-কিশোর

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনালাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৫০ জন শিশু-কিশোরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ১৫০ জন বিজয়ীর মধ্যে ১৮ই জুন বর্ণাঢ্য আয়োজনে তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকারী ৩০ জনসহ ৫০ জন বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভাপতি আ ক ম মোজাম্মেল হক। বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় ওয়ালটনের ১৭টি ল্যাপটপ, ট্যাব, স্মার্টওয়াচ ও ব্লুটুথ স্পিকার।

শিশুদের সাঁতার শেখানোর প্রকল্প

শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ, সুরক্ষা ও সাঁতার শেখানোর জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১২ই জুন রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫ লাখ ৬০ হাজার শিশুকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাঁতার শেখানো হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সামাজিক শিশুযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও শিশুদের সাঁতার শেখানোসহ অভিভাবকদের সচেতন করা হবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। দেশের ১৬টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় ৮ হাজার শিশুযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিজ এবং যুক্তরাজ্যের রয়্যাল ন্যাশনাল লাইফবোট ইনস্টিটিউটের অনুদান ৫৪ কোটি ২০ লাখ ৭৩ হাজার টাকা এবং বাকি ২১৭ কোটি ৬১ লাখ ৮৪ হাজার টাকা সরকারের তহবিল থেকে জোগান দেওয়া হবে। ২০২৪ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে প্রকল্পটি শতভাগ বাস্তবায়িত হবে।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিকাশ ও কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা অনেক বেশি মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন। মহান সৃষ্টিকর্তা তাদের বিশেষ মেধা, গুণ ও দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সরকার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিকাশ ও কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের হাত ধরেই বাংলাদেশ অটিজম নিয়ে সর্বাগ্রে কাজ শুরু করে। তার উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য খাতে খাতভিত্তিক কর্মসূচিতে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার ও নিউরো ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কিত ডিজঅর্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সরকারের পক্ষ থেকে মাসিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সারা দেশের সকল

'চিত্রকলা এবং অটিজম নিয়ে জীবনযাত্রা: বালক রাজা আদিল হক' শীর্ষক আদিল হকের একক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ

উপজেলায় অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রতিমন্ত্রী ৩রা জুন রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে 'চিত্রকলা এবং অটিজম নিয়ে জীবনযাত্রা: বালক রাজা আদিল হক' শীর্ষক আদিল হকের একক চিত্র প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বৈশ্বিক অভিগম্যতা সচেতনতা দিবস পালন

১৯শে মে পালিত হয় 'গ্লোবাল অ্যাকসেসিবিলিটি অ্যাওয়ারনেস ডে' বা বৈশ্বিক অভিগম্যতা সচেতনতা দিবস। দেশে প্রথমবারের মতো দিবসটি পালিত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল অভিগম্যতার ব্যাপারে সচেতন করতে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটির উদ্দেশ্য– অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল (ওয়েব, সফটওয়্যার, মুঠোফোন ইত্যাদি) অভিগম্যতার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২০১২ সাল থেকে দিবসটি পালন করা হয়। প্রতিবছর মে মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার দিবসটি পালিত হয়।

বাংলাদেশে চলতি বছর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইসিটি বিভাগের বাস্তবায়নাধীন অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রকল্প, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে দিবসটি পালিত হয়। আয়োজকেরা বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে দিবসটি পালনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অভিগম্যবান্ধব ওয়েব, মুঠোফোন অ্যাপ ও ডিজিটাল সেবা সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন। এছাড়া সেবামূলক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব ডিজিটাল সেবা অভিগম্য করার বিষয়ে সচেতন হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ থানা জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৯ দশমিক ৬ শতাংশ ব্যক্তির কোনো না কোনো প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। ইতোমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ২৪ লাখের বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শনাক্ত করে তাদের নিবন্ধন করেছে।

বাংলাদেশ ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসনস উইথ ডিজঅ্যাবেলিটি (ইউএনসিআরপিডি) স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে। জাতিসংঘের এই কনভেনশনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সব সেবা অন্যান্য নাগরিকের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফশিলে তথ্য বিনিময় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে একটি আলাদা অংশ রয়েছে। এতে বলা হয়, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ইন্টারনেটে যে তথ্য-সেবা প্রচার করবে, সেগুলো বিভিন্ন প্রযুক্তি ও পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহার উপযোগী করতে হবে। সরকারি সংস্থাগুলোর যেসব ই-সেবা রয়েছে, সেগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজ প্রবেশের পাশাপাশি তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে ৩৩ হাজারের বেশি সরকারি ওয়েবসাইট ও ডিজিটাল নাগরিক সেবা রয়েছে। এছাড়া 'মুক্তপাঠ' বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। মুক্তপাঠের স্লোগান–'শিখুন, যখন যেখানে ইচ্ছে'। যে কেউ এখানে বিনামূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স করতে পারেন। বর্তমানে মুক্তপাঠের অধিকাংশ কোর্স দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী। এছাড়া এটুআইয়ের তৈরি ওয়েবসাইটগুলো গড়ে ৭০ শতাংশ অভিগম্যতা নিশ্চিত করেছে।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার পেলেন ৮৫ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ক্রীড়াঙ্গনে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৮৫ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও সংগঠককে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান করেন। ১১ই মে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ২০১৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশের ক্রীড়াঙ্গনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৮৫ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও সংগঠককে মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে। পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেকে পাবেন ১৮ ক্যারেট মানের ২৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, এক লাখ টাকার চেক ও একটি সনদপত্র। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র শহিদ শেখ জামালকে ২০২০ সালের খেলোয়াড় ও সংগঠক হিসেবে (মরণোত্তর) পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাঁর পক্ষে পরিবারের সদস্য ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল পুরস্কার গ্রহণ করেন।

এশিয়া কাপে ৮টি পদক বাংলাদেশের

এশিয়া কাপে ৮টি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। এবারের এশিয়া কাপ আর্চারিতে ভালো কিছুর প্রত্যাশায় ইরাকের সুলাইমানিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল বাংলাদেশের আর্চাররা। ১১ই মে ফাইনালের

স্নায়ুক্ষয়ী লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতের কাছে ৫-৪ সেট পয়েন্টে হেরে যায় বাংলাদেশের মেয়েরা। ফলে ৮টি পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় রোমান সানা-দিয়া সিদ্দিকীদের। যার মধ্যে রয়েছে– ৪টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ। এশিয়া কাপে বাংলাদেশের এক আসরে এটিই সর্বোচ্চ পদক অর্জন।

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেস্টে পাঁচ হাজার রান মুশফিকের

টেস্টে পাঁচ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন মুশফিকুর রহিম। তিনিই প্রথম বাংলাদেশি যিনি লং ভার্সনের ক্রিকেটে প্রথম এ রান অর্জন করলেন। ১৮ই মে চট্টগ্রামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টে এ রেকর্ড গড়েন অভিজ্ঞ এ ব্যাটসম্যান। এই টেস্ট শুরুর আগে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের মালিক ছিলেন 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল' খ্যাত এই টাইগার ব্যাটার। তবে প্রথম ইনিংসে ওপেনিংয়ে নেমে ১৩৩ রানের ঝলমলে এক ইনিংস খেলে মুশফিককে টপকে শীর্ষে উঠে যান তামিম ইকবাল। তামিম শারীরিক অসুস্থতার কারণে 'রিটায়ার্ড হার্ট' হয়ে বিশ্রামে গেলে বাঁহাতি ব্যাটসম্যানকে ছাপিয়ে আবার শীর্ষে ওঠেন মুশফিক। টেস্টে মোট ১৪৯ ইনিংস খেলে এ অর্জন নিজের করে নিলেন মুশফিকুর রহিম।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব

গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই

উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

চলে গেলেন অমর একুশে গানের রচয়িতা, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

আফরোজা রুমা

কালজয়ী অমর একুশে গানের রচয়িতা, কিংবদন্তি সাংবাদিক, কলামিস্ট ও সাহিত্যিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ১৯শে মে লন্ডনের বার্নেট হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, কিডনি রোগসহ বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

১৯৩৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। তাঁর বাবা ওয়াহিদ রেজা চৌধুরী ও মা মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন। ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পাস করে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বিএ অনার্স পাস করেন। স্কুলে পড়ার সময় কংগ্রেস নেতা দুর্গা মোহন সেন সম্পাদিত *কংগ্রেস হিতৈষী* পত্রিকায় কাজ শুরু করেন।

১৯৫০ সালে গাফ্ফার চৌধুরী *দৈনিক ইনসাফ* পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরের বছর *দৈনিক সংবাদ* প্রকাশ হলে তিনি সেখানে অনুবাদকের কাজ করেন। মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের *মাসিক সওগাত* পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন গাফ্ফার চৌধুরী। সম্পাদনা করেছেন *মাসিক নকীব*। আবদুল কাদির সম্পাদিত *দিলরুবা* পত্রিকারও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ওই বছরই তিনি প্যারামাউন্ট প্রেসের সাহিত্য পত্রিকা *মেঘনার* সম্পাদক ছিলেন। মাওলানা আকবর খাঁর *দৈনিক আজাদ*-এ সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন তিনি। এসময় মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকার স্বল্পকালীন সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি *দৈনিক জেহাদ*-এ বার্তা সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালে তিনি সাপ্তাহিক *সোনার বাংলার* সম্পাদক হন। ১৯৬৪ সালে সাংবাদিকতা ছেড়ে ব্যাবসায় নামেন এবং অনুপম মুদ্রণ নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে *দৈনিক আওয়াজ* বের করেন। ১৯৬৭ সালে আবার তিনি *দৈনিক আজাদ*-এ ফিরে যান সহকারী সম্পাদক হিসেবে। ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারি *ইত্তেফাকের* মানিক মিয়া মারা গেলে তিনি আগস্ট মাসে হামিদুল হক চৌধুরীর অবজারভার গ্রুপের *দৈনিক পূর্বদেশ*-এ যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সপরিবার সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আগরতলা হয়ে কলকাতা পৌঁছান। সেখানে মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র সাপ্তাহিক *জয় বাংলায়* লেখালেখি করেন। এসময় তিনি কলকাতায় *দৈনিক আনন্দবাজার* ও *যুগান্তর* পত্রিকায় কলামিস্ট হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর *দৈনিক জনপদ* বের করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলজেরিয়ায় ৭২ জাতি জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যান। দেশে ফেরার পর তাঁর স্ত্রী গুরুতর রোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে কলকাতা নিয়ে যান। সেখানে সুস্থ না হওয়ায় তাঁকে নিয়ে ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি জমান। এরপর থেকে তাঁর প্রবাস জীবনের ইতিহাস শুরু হয়।

১৯৭৪ সাল থেকে লন্ডনে বসবাস করলেও মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পক্ষে তাঁর কলম সোচ্চার ছিল বরাবর। প্রবাসে থেকেও ঢাকার পত্রিকাগুলোতে তিনি যেমন রাজনৈতিক ধারাভাষ্য আর সমকালীন বিষয় নিয়ে একের পর এক নিবন্ধ লিখে গেছেন, তেমনি লিখেছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধ। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর অন্যতম কবিতা– 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি...।'

ছাত্রজীবনেই আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে *সওগাত* পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'স্বাক্ষর' প্রকাশিত হয়। গাফ্ফার চৌধুরীর প্রথম বইটি ছিল শিশুদের জন্য। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। বইয়ের নাম *ডানপিটে শওকত*। প্রথম গল্পগ্রন্থ *কৃষ্ণপক্ষ* প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান*। এছাড়া রয়েছে– *সম্রাটের ছবি*, *সুন্দর হে সুন্দর*, *নাম না জানা ভোর*, *নীল যমুনা*, *শেষ রজনীর চাঁদ*। সম্পাদনা : *বাংলাদেশ কথা কয়*, *আমরা বাংলাদেশী নাকি বাঙ্গালী*, *বঙ্গবন্ধু আজ যদি বেঁচে থাকতেন*, *গান্ধীর দর্শন ও শেখ মুজিবের রাজনীতি*, *বাঙালির অসমাপ্ত যুদ্ধ*, *আমার বঙ্গবন্ধু আমার বাংলাদেশ*, *বঙ্গবন্ধু : মধ্যরাতের সূর্যতাপস*, *বাংলাদেশ : বামপন্থী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা*, *কালান্তরের কড়চা*, *হাসিনা ও রেহানা অ-রূপকথার দুইবোন*, *নিরুদ্দিষ্ট নয় মাস* উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা নাটকের মধ্যে রয়েছে– *পলাশী থেকে বাংলাদেশ*, *একজন তাহমিনা* ও *রক্তাক্ত আগস্ট*। নিজের লেখা রাজনৈতিক উপন্যাস *পলাশী থেকে ধানমন্ডি* অবলম্বনে ২০০৭ সালে একটি টেলিভিশন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন গাফ্ফার চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ হাসিনাকে নিয়ে তিনি নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র *দুর্গম পথের যাত্রী*।

খ্যাতিমান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী দেশে-বিদেশে বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), ইউনেসকো পুরস্কার (১৯৬৩), বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, সংহতি আজীবন সম্মাননা পদক ২০০৮ (লন্ডন), স্বাধীনতা পদক ২০০৯, মানিক মিয়া পদক ২০০৯, যুক্তরাজ্যের ফ্রিডম অব বারা (টাওয়ার হ্যামলেটস) উপাধি সংহতি আয়োজিত প্রবাসীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা, ঢাকা ২০০৯। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

হাজারো মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন মহান একুশের প্রধান সংগীতের রচয়িতা, বরেণ্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। ২৮শে মে মরহুমের ইচ্ছানুযায়ী রাজধানীর মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে স্ত্রী সেলিমা আফরোজ চৌধুরীর পাশে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

mwPÎ evsjv‡`k পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা/ছড়া, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা/ছড়া হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতা/ছড়ার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা/ছড়া পাঠাতে হবে। কবিতা কিংবা ছড়াগুচ্ছ কোন বিভাগের জন্য লেখা– তা স্পষ্ট করতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 13, June 2022, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
Z_¨ I m¤úPvi gšYvjq
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Ryb 2022 ■ ˆR¨ô-Avlÿvp 1429